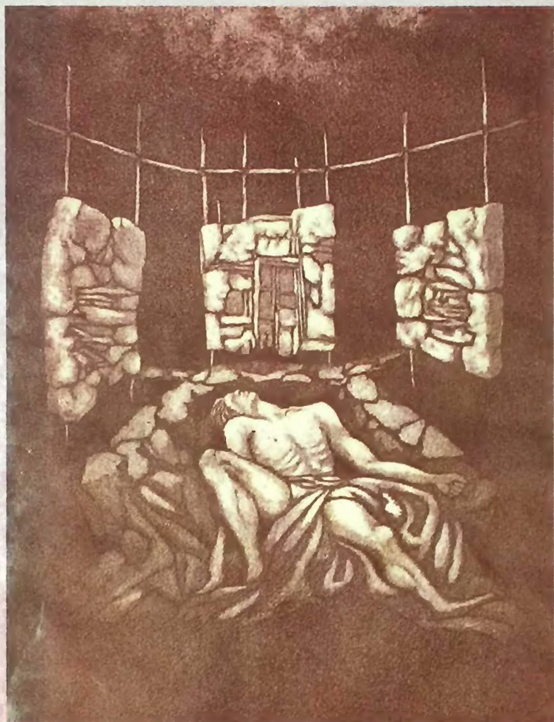


অন্ধকারের একশ বছর

আনিসুল হক

অদ্ভুত এক অন্ধকার নেমে
এসেছে এই জনপদে।
এখানে গান গাওয়া নিষিদ্ধ, প্রাণীর ছবি আঁকাও
অপরাধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারণা তো দূরের কথা।
সেই অন্ধকার জনপদে এক শিল্পী-দম্পতির
দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে এই উপাখ্যানের শুরু হলেও ধীরে
ধীরে উন্মোচিত হয়েছে আরো বড় প্রেক্ষাপট,
সাম্প্রদায়িকতার শত শত বছরের ইতিহাসের পাঠ
থেকে নির্দেশ করা হয়েছে এর ভয়াবহতম পরিণতি।
অন্ধকারের একশ বছরকে
বলা যেতে পারে এই উপমহাদেশে ক্রমপ্রসারমান
এক অন্ধকার শক্তির একশ বছর।
কিংবা এ সবের কিছুই নয়,
এক কল্পনাপ্রতিভাবান লেখকের রচিত রাজনৈতিক
কল্পকাহিনী মাত্র।
কেউ কেউ এটিকে আখ্যায়িত করেছেন ভবিষ্যৎ বাদী
উপন্যাস বলে। যাই হোক না কেন,
এ রকম উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে সম্পূর্ণ অভিনব,
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী, সন্দেহ নেই।
সাপ্তাহিক *মৌচাকে ঢিল*-এ
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় থেকেই এটি
পাঠকনন্দিত হয়ে আসছে বিপুলভাবে।

৬০.০০ টাকা

অন্ধকারের একশ বছর

আনিসুল হক



একটি পত্রিকা
একটি বইয়ের দোকান
একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০



ISBN 894-8088-12-1

অন্ধকারের একশ বছর

আনিসুল হক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

প্রচ্ছদ

অশোক কর্মকার

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
বর্ণ বিন্যাস ৪৪ আরামবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : **বুক ক্লাব**, ১২২ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

৬০.০০ টাকা

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : এই গ্রন্থে এক কাল্পনিক ভবিষ্যতের ছবি আঁকা হয়েছে। যে সব স্থান-ঘটনা-চরিত্র রয়েছে সেই কাল্পনিক ভবিষ্যতে, সে সবও কাল্পনিক। বর্তমানের কোনো ঘটনা-চরিত্রের সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সূত্রসমেত ব্যবহৃত ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগুলো, বলাই বাহুল্য, কাল্পনিক নয়। এবং এ সমস্ত উদ্ধৃতি অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে পুরোপুরি।

উৎসর্গ

জাহানারা ইমামের অমর স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে (কবিতা ১৯৮৯)
আমি আছি আমার অনলে (কবিতা ১৯৯১)
আসলে আয়ুর চেয়ে বড়ো সাধ তার আকাশ দেখার (কবিতা ১৯৯৫)
গদ্যকার্টুন (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৩)
কথাকার্টুন (বিদ্রূপ রচনা ১৯৯৪)



সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম–আকাশে আলোর যে ক্ষীণ আভাটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও আর নেই। অন্ধকার। কতোদিন সূর্যের মুখ দেখি না, মনে করবার চেষ্টা করেন শফি আকবর। মনে পড়ে না। শুধু অন্ধকার।

একটা শেয়াল হেঁটে যায় তাঁর পাশ দিয়ে। অন্ধকার।

তিনি বসে আছেন সমুদ্র সৈকতে। অন্ধকার আর ঘন জঙ্গল। অথচ এ জায়গাটা মাত্র বিশ–ত্রিশ বছর আগেও ছিল পর্যটকদের কলরবে মুখর, পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত হিসেবে আলোকিত। যখন ডুবে যেতো সূর্য, তখন আলো দিতো সমুদ্র। সমুদ্রের ফেনায় জ্বলে উঠতো ফসফরাস, ফ্লোরেসেন্ট লাইটের মতো। কতোবার এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। তাঁর পাশে বসা থাকতো নাসিমা। তাঁরা তখন কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে বসতে পারতেন সমুদ্রের ধারে। এমন প্রকাশ্য খোলা জায়গায় কি অনায়াসেই না চলে আসতে পারতো একজন মানবী!

এখন পারে না। দরিয়ার পাশে কোনো আওরাতের আসার নিয়ম নেই। তাতে দরিয়ার পর্দা নষ্ট হয়। সমুদ্রের পবিত্রতা নষ্ট করা খুবই গুনাহের কাজ। কবীরা গুনাহ। যা কবীরা গুনাহ, তা এদেশে ফৌজদারী আইনেও মারাত্মক অপরাধ। এক সময় এদেশে নদীর সঙ্গে নারীর মিল দেবার রীতি ছিল। নদীর ধারে যেমন গড়ে ওঠে জনপদ, তেমনি সভ্যতার জন্যও নারী অপরিহার্য। এই সমুদ্রতীরটি আজ যেন সভ্যতার বাইরে। এতো অন্ধকার যে, সমুদ্র পর্যন্ত আলো দেয় না। আকাশেও কোনো তারা নেই।

ছেলেবেলায় শফি আকবর খুব আকাশ দেখতেন। তাঁর রবীন স্যার তাঁকে শিখিয়েছিলেন। অন্ধকার আকাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখিয়ে বলতেন, ওই হচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। বলো তো, সপ্তর্ষির সন্ধিবিচ্ছেদ কী? সপ্ত যোগ ঋষি স্যার। চটপট উত্তর দিতেন বালক শফি আকবর।

এখন আর আকাশে সাতটি ঋষি ওঠে না। এখন বড় জোর উঠতে পারে সাত আউলিয়া। অবশ্য আউলিয়াদেরও আজ আর কদর নেই। এখন কদর আমীরদের, রুকনদের। কিন্তু আকাশে কোনো তারা নেই। চাঁদ নেই। এতো অন্ধকার।

যে সৈকতটিতে তিনি বসে আছেন, তার নাম ছিল লাবণী। লবণ থেকে লাবণী। এখন নামটা সামান্য বদলে দেয়া হয়েছে লোবানী। সার্থক নাম। বাতাসে ভেসে আসছে লোবানের গন্ধ। কাছেই একটা খানকাহ শরীফ। আগে সেটা ছিল পর্যটকদের মোটেল। এখন সেখানে ঠাঁই নিয়েছেন একজন ফকিরবাবা। এই মাটিতে তার দাদা সত্যপীর শুয়ে আছেন। এখন তিনি গদীনশীন। তারই খানকাহ থেকে ভেসে আসছে লোবানের গন্ধ। মাঝে মাঝে জিকিরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর ডাকছে শেয়াল। আকাশে উড়ছে বাদুড়। অন্ধকারের গায়ে উড়ন্ত অন্ধকার।

মশা কামড়াচ্ছে। শফি আকবর তাঁর গালে থাপ্পড় বসান। গালভর্তি দাড়ি। এদেশে দাড়ি রাখা

অবশ্য কর্তব্য। যারা দাড়ি রাখে না, তাদের জন্য বিধান রয়েছে মাসে একদিনের সশ্রম কয়েদ আর জরিমানার। মেরে যে ফেলে না এই বেশি। দাড়ি না রাখলে জ্যান্ত কবর দেয়া উচিত কি উচিত নয় এই নিয়ে পত্রিকায় বেশ কিছুদিন বাহাস ছাপা হয়েছে। দাড়ি রাখা সুন্নাত না ওয়াজিব সেই বিষয়ে আলেমগণ সুচিন্তিত আর্টিকেল লিখেছেন। ফরজ না হওয়ায় শাস্তি হয়েছে লঘু ধরনের। গোঁড়া ইনকিলাবীরা তাতে নাখোশ।

মশাগুলো খুবই যন্ত্রণা করছে। তিনি গালে আরেকটা চড় মারেন। মারা গেছে।

শফি আকবরের হাতে মশার রক্ত। তিনি কাঁপতে থাকেন নানা আশংকায়। সমুদ্রের পানিতে নামেন। উবু হয়ে হাত ধোন।

ওই রক্ত মশার নয়, তাঁরই। সমুদ্র তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কতো রক্ত মিশে আছে এই সমুদ্রে, ভাবতেই গা সিরসির করে ওঠে শফি আকবরের। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। জোর একটা ঝাপটা এসে হাঁটু অবধি ধুয়ে দেয় তাঁর। জলের স্পর্শ তিনি অনুভব করতে পারেন, কিন্তু চোখে কিছুই দেখেন না। চারদিকে ঘন অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে নিজের হাত নিজে দেখা যায় না। এই জনপদে কোনোদিন কি সূর্য উঠেছিল? আবার কোনোদিন কি উঠবে?

ঘন অন্ধকারে সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে চারদিকে তিনি দেখেন ঘন অন্ধকার। সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় তাঁর বুঝিবা চিত্তভ্রষ্ট হয়, তিনি কালজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। উপরে অপার আকাশ, সামনে অনন্ত সমুদ্র তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তোলে। তিনি গেয়ে ওঠেন,

'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক হইয়া যাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ওই চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনের জোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে
ওহে বাঁধনকামী।'

তিনটা শিয়াল দৌড়ে পালায়। একটা বাদুড় পাখা ঝাপটায়। সমুদ্রে একটা গর্জন ওঠে।

হা-হা-হা-হা।

কে হাসে? কে ওখানে? শফি আকবর আর্তস্বরে বলেন।

তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ওই যে তুমি গাইছিলে 'সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে ওহে বাঁধনকামী', তা মঞ্জুর হয়েছে।

শফি আকবর ব্যাপারটা ঠাওর করতে পারেন না। পাছায় রাইফেলের বাট পড়তে তিনি ধাতস্থ হন।

তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তুমি একজন বেদ্বীনের রচিত নিষিদ্ধ সঙ্গীত গাইছিলে। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

শফি আকবর হাঁটতে থাকেন। তাঁর কোমরে দড়ি। কতোজন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি বুঝতে পারছেন না। এদের মধ্যে একজন বেশ বাচাল প্রকৃতির। সে বলে, খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। গল্প করলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। আচ্ছা বলো তো, আমরা কি করে বুঝলাম, ওই অন্ধকারে একজন লোক গান গাইছে?

আমি জানি না।

খুবই সহজ। সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় হঠাৎ করে জোনাকী দেখা গেলো। এই জায়গায় এর আগে কখনো কেউ জোনাকী দেখেনি। তাতেই আমাদের সন্দেহ হলো। আমরা এদিকটায় ছুটে এলাম। একেই বলে উপস্থিত বুদ্ধি। হা–হা–হা।

শফি আকবরের কানে সেই হাসির শব্দ মনে হয় দূরাগত হায়েনার ডাক।

তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা? পাহাড়ের মধ্যে ঘন জঙ্গলে নাকি থানায়? কারা তাকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ নাকি বদরিয়া শিবিরের সদস্যরা? পুলিশ নিলে বিচার হবে শরিয়তি আইন অনুসারে, বিচারে সময় লাগবে, যা হোক একটা কিছু সাজা হবে। সে সাজা খুব কঠিন কিছুও হতে পারে। হয় তো গান গাইবার শাস্তি হবে জিভ কেটে ফেলা। কিন্তু বদরিয়া শিবির নিলেই মুশকিল। জঙ্গা জঙ্গলার মধ্যে পড়ে থাকতে হবে লাশ হয়ে, কেউ জানবেও না। শেয়ালে শকুনে এসে ঠুকরে খাবে দেহ।

আমি কি জানতে পারি আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে না। নীরবতা নেমে আসে। তারা হাঁটতে থাকে। আবার মশা এসে বসে শফি আকবরের গালে।

কোত্থে কে যেন নারীকণ্ঠের বিলাপ ভেসে আসে। নীরবতা ভেঙে যায়। কোনো নারীকণ্ঠ ঘরের বাইরে আসা আইনবিরুদ্ধ। কতোদিন প্রকাশ্য এলাকায় কোনো রমণীর কথা শোনেনি এই পুরুষেরা।

লোকগুলো শিউরে ওঠে। হঠাৎ ধুপধাপ আওয়াজ। ঢিল পড়তে থাকে এলোপাতাড়ি। একটা ঢিল এসে পড়ে শফি আকবরের হাঁটুতে। তিনি কঁকিয়ে ওঠেন।

তার আগেই কোমরের দড়িতে টান পড়ে। আল্লার নাম নেন। জ্বীনের আছর পড়েছে। আল্লাহর নাম নেন। বাচাল লোকটির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

কোমরে দড়িবাঁধা শফি আকবরকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়াতে থাকে সশস্ত্র লোকগুলো। একজন বলে, কার পকেটে দিয়াশলাই আছে, বের করো জলদি। আলো জ্বালালে জ্বীন এখানে থাকতে পারবে না। হালুয়া টাইট হয়ে যাবে। জ্বীনের ওষুধ হচ্ছে আগুন।

একজন পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে। আগুন ধরানোর চেষ্টা করে।

আগুন জ্বলে না।

আলো জ্বলে না।

ঘন অন্ধকার। সামনে এবং পেছনে। জ্বীনের মেয়েরা হাসছে অশরীরী কণ্ঠে।

আর ঢিল পড়ছে ধুপধাপ।

লোকগুলো জোরে দৌড়ায়। শফি আকবরও তাদের সঙ্গে। একজন দোয়া পড়তে থাকে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা...।



আতিউর রহমান মিজানী ছাহেব এরতেজা করেছেন আবার শাদী করবেন তিনি। দিলে তাঁর রঙ ধরেছে, এটা প্রমাণের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন মেহেদী। চোখে ভালো দেখতে পান না বলে নিজের কাজটুকু নিজে করা প্রায় অসম্ভব। তাঁকে সাহায্য করছে তিনজন বাঁদী।

হুজুরপাক, মেহেদী এনেছি। বাটা মেহেদী। মিহি করে বেটেছি। রঙে টুকটুক করছে।

কে, গুলমোহর। আয়, আয়, কাছে আয়।

আমি একা নই, চাঁদবানু আর মালকাও আছে।

কে আছে বললি।

চাঁদবানু আর মালকা।

গুলমোহর বলে উচ্চকণ্ঠে, যাতে বুড়োর কানে পৌঁছোয়। পৌছানোটা খুবই জরুরী, নইলে সে একা আছে ভেবে বুড়োর হাত আবার হয়ে উঠতে পারে ক্রীড়াপরায়ণ।

চাঁদবানু বলে, হুজুরপাকের মনে রঙ লেগেছে মনে হচ্ছে। হি-হি-হি।

নারীকণ্ঠের হাসি। যেন বাজছে কাচের চুড়ি। মিজানী ছায়েবের কানে সেই কথা ঠিকই পৌছে যায়। যারা কানে কম শোনে, তাদের রয়েছে এক অদ্ভুত শক্তি।

তাদের সমালোচনা কিংবা নিন্দাবাক্যটি ঠিকই কর্ণকুহর দিয়ে মর্মে পৌছোয়।

মিজানী বলেন, খামোশ। হাসবা না, খবরদার হাসবা না। সবকিছু নিয়ে ফাজলামো করবা না। মেহেদী মাখা সোয়াবের কাজ। দাও, আমারে মেহেদি মাখায়ে দাও। একটা চুলে মেহেদী মাখায়া দিলে সত্তরটা সোয়াব পাইবা, আমার দোয়া।

হুজুরের মাথায় তো একটা চুলও নাই। টাক মাথায় মেহেদী দিলে কোন হিসাবে সোয়াব পাওয়া যাইব, হুজুরপাক। হি-হি-হি।

চাঁদবানুর গলা, বেশি কথা বলে মেয়েটা। এখনি একটা চড় মারা দরকার। আওরাত-জেনানাকে শাসন করার কথা লেখা আছে কেতাবে। নিজ হাতে যে চড় মারবেন, মিজানীর হাতে নেই এতোটা শক্তি।

গুলমোহর চাঁদবানুর গালে একটা চড় মার। এক্ষুণি মার। একটা চড় মারলে ১৪০টা সোয়াব, না মারলে কঠিন গুনাহ। কি মারছিস?

মিজানী ছাহেব রাগে কাঁপতে থাকেন থরথর করে। তিনি বসে আছেন যে তাকিয়াটায়, কাঁপুনি সঞ্চারিত হয় তাতেও। তাঁর চোখ বিস্ফারিত প্রায়। এতক্ষণ তিনি ছিলেন বালিশ গুঁজে, আধাশোয়া হয়ে, এবার উঠে বসেন মেরুদণ্ড সোজা করে।

এই তিন পরিচারিকা পরিচিত এই পরিস্থিতির সঙ্গে। খুবই ভয়াবহ এই অবস্থা। এক্ষুণি তিনি বেল বাজাতে পারেন। ছুটে আসতে পারে তার দেহরক্ষী দলের সদস্যরা। সেক্ষেত্রে এই তিন নারীর

পরিণতি হবে চরম।

তারা ভয় পেয়ে যায়। নীরবে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হয়।

হুজুরপাকও সম্বরণ করেন ক্রোধ। আজ তাঁর একটা শুভ দিন। তিনি খায়েশ করেছেন আরেকটা শাদী করার। এই দিনে কোনো হাঙ্গামা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছেন, মাথা যতো ঠাণ্ডা, ফল ততো গরম। মাথা গরম করে আনাড়ি লোকেরা। 'খুন করে ফেলবো, একদম খুন করে ফেলবো' বলে যে চেঁচায়, সে আদপে খুন তো দূরের কথা, গুম্ফকেশ পর্যন্ত ছিঁড়তে পারে না। মিজানীর মনে পড়ে প্রথম যৌবনের কথা। জেনারেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তিনি আর গুল-মে-আযম। জেনারেল ভাব এমন করলেন যেন ভায়রাবাড়িতে গিয়েছেন তাঁরা। বললেন, একা একা কেন এসেছেন, বিবি সাহেবানরা কোথায়। সঙ্গে আনলেই হতো। একটা মাসায়েল শিখিয়ে দিতাম। মহব্বত কিরূপে স্থায়ী করা যায়, তার মাসায়েল। হা-হা-হা। তারপর আপনাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সব ফাইনাল কিনা? আজ রাতেই স্টার্ট করুন। সাত দিনের মধ্যে সব কাবার। যা করাবেন, বাঙালিদের দিয়ে করাবেন। কি, ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, প্রোগ্রাম ঠিক ছিল। কতোদিন আগের কথা, তবুও মনে পড়ে মিজানী সাহেবের। কতো ঠাণ্ডা মাথায় তিনি করেছিলেন সেসব কাজ। নিজ হাতে প্রস্তুত করেছিলেন বুদ্ধিজীবীদের তালিকা। বুদ্ধিজীবী না ছাই। কমিউনিস্ট। আহা, তখন রক্ত ছিল গরম, শরীরে ছিল তাকদ, মাথা ছিল ঠান্ডা।

আর এখন এসব কি করছেন তিনি? শরীর ঠান্ডা মেরে গেছে, মাথা করছেন গরম। দাসী বান্দীদের উপর যে চেতে যায়, সে কোনো কাজের নয় আসলে।

আপন মনেই বিড় বিড় করেন মিজানী ছাহেব। বাঁদী তিনজন তাঁকে মেহেদী মাখাতে থাকে। সমস্ত চুল পড়ে গেছে। ভ্রু পেকে গেছে, পেকে গেছে কানের চুলও। একজন পরিচারিকা তাঁর নাকের পাকা চুলে মেহেদী দেবার চেষ্টা করে। হাঁচি দিয়ে সব মাটি করে ফেলেন মিজানী।

আবার রেগে যান তিনি। ভাগিয়ে দেন পরিচারিকা তিনজনকে। এরা কোনো কাজের নয়, কেবল জ্বালাতে পারে তাকে।

খাদেম মোল্লাকে ডাকেন তিনি। খাদেম মোল্লা হচ্ছে তাঁর খাদেম। একাত্তরের গন্ডগোলের সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে থাকে। ওই সময় তার কাজ ছিল রাইফেল কাঁধে মিজানীর বাড়ি পাহারা দেয়া। লোকটা একটা অতিবাধ্য কসাই। যা করতে বলা যায়, তাই করে। সবসময়েই সে ছিল মিজানীর সঙ্গে। কতো ঝড়বাদল ঝঞ্ঝা গেলো তাঁর শতবছরের জীবনে। কতো উথান, পতন। খাদেম আছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। উনিশশ বাহাত্তরের দিকে পালাতে হয়েছিল তাদের। মিরাজগঞ্জ থেকে পালিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন যশোরের দিকে। সেই গ্রামে মিজানীর প্রথম বিয়ে। সে সময়ও খাদেম মোল্লা ছিল তাঁর পাশে। বিয়ে ঠিক করেছিল সেই। এক মুক্তিযোদ্ধার ভাগ্নীর সঙ্গে। পরিচয় গোপন রেখে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিয়ের। খাদেম মোল্লা এসে বলেছিল, হুজুর, মাইয়া খুবসুরত। দুধও দিবো, হালও বাইবো। মানে হইলো গিয়া, আপনার শোওনের জায়গাও হইলো আবার মাথার উপর একটা ছাতার মতো সিকিউরিটিও পাইলেন। মাইয়ার মামা মুক্তি। মুক্তি হইলেও দিলটা নরম। খুবই পরহেজগার।

কতো বছর পর আবার সেই খাদেম মোল্লাই তাঁর নতুন নিকাহের ব্যবস্থা করছে। মিজানীর প্রথম বউটি মারা গেছে, সেও ত্রিশ বছর হতে চললো। নাতি-নাতনিরা সবাই বালেগ। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পরে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সেই ঘরেও নাতি আছে। সেই স্ত্রী এখনো বর্তমান।

এ তল্লাটে তাঁর মতো বয়স্ক আর কেউ নেই। এরপরেই খাদেম মোল্লা। তবে খাদেম মোল্লার শরীর–স্বাস্থ্য তাঁর চেয়ে ভালো।

খুবই নিঃসঙ্গতার কাল এই বার্ধক্য। মিজানী ছাহেবও খুবই একা। সমুদ্রের ধারে ঘনজঙ্গলের মধ্যে থাকেন তিনি। সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাঁর বয়স যখন সত্তর পেরিয়ে যায়, তখনই পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে রিটায়ার দেয় তাকে। পরে পার্টি যখন বিপ্লব সম্পন্ন করে তখন তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় এ অঞ্চলে। এখানে তিনি পালন করছেন সাংগঠনিক শরিয়া আদালতের হাকিমের দায়িত্ব। ইনসাফের প্রতীক হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা বা মিজান। আতিউর রহমান সাহেবের মিজানী খেতাবটা এসেছে সেখান থেকেই।

খাদেম নাকি?

জ্বী আমি খাদেম। খাদেম মোল্লা।

কাছে এসে বসো।

খাদেম কাছে আসে মিজানীর। তাকিয়ার উপরে বসে। লোলচর্ম দুইবৃদ্ধ। মনে হয় দুই শকুন বসে আছে মড়া গাছের মগডালে।

কালরাতে একটা খোয়াব দেখলাম খাদেম। সহি খোয়াব। খোয়াবে আমার ওপর সুন্নাত পুরা করার হুকুম হয়েছে। আমি মাত্র দুইটা বিয়া করেছি। আরো দুইটা করার হুকুম। এখন কি করা যায়, খাদেম।

খাদেম মোল্লা এ স্বপ্নের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায় না। গত ১৫ দিনে এই খোয়াবের বিবরণ অন্তত ২৭ বার শুনতে হয়েছে তাকে। বুড়ো হলে মানুষ বাচাল হয়, একই কথা বলতে থাকে বার বার, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

মিজানী ছাহেবকে খুবই ভক্তি করে খাদেম। এই পুরোনো গল্পটা শুনে সে বলে, তা হলে তো হুজুরের শাদীর ব্যবস্থা করতেই হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই আঞ্জামই করছিলাম। পাত্রী পাওয়া গেছে। আপনি চিন্তা কইরেন না।

চিন্তা একটা আছে খাদেম।

কি চিন্তা? মেয়ের বয়স কমই আছে। ৮/১০ বছরের বেশি হইবো না।

বেশি ছোট হয়ে গেলো না?

কি কন হুজুর। বয়সের ব্যবধান কোনো ব্যাপার না। হুজুরপাক কি বৃদ্ধ বয়েসে বালিকাকে বিবাহ করেন নাই? করেছেন। এটা তো আপনিই আমাকে বলেন। তাছাড়া পাত্রী দেখতে খুবই ভালো। হুরপরীর মতো।

না, পাত্রী দেখতে হুরপরীর মতো কিনা এই নিয়ে মিজানী ছাহেব চিন্তিত নন। এই বয়সে তিনি সুন্দরী নিয়ে কিই বা করবেন? চোখেই ভালো দেখতে পান না। হাম্মামখানায় যেতে হয় অন্যের কোলে চড়ে। তিনি চিন্তিত সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয়ে। এই বয়সে আরেকবার শাদী করবার পেছনে তাঁর রয়েছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। সম্প্রতি তাঁর বার্ধক্যের সুযোগে এ এলাকায় কেউ কেউ তাঁকে মানতে চাইছে না। তাঁর মহলের মধ্যেই কেউ কেউ বলছে, বুড়োর মতিগতির ঠিক নেই। সে কিসের বিচার করবে? তিনি এদের মুখ বন্ধ করে দিতে চান। এই শতবছরের কোঠায় পা দিয়ে শাদী করে তিনি দেখাতে চান, আসলে মোটেও বৃদ্ধ হননি তিনি।

লোকজন অবশ্য এই নিয়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। প্রধানত মিজানীর বিরুদ্ধে কথা বলে মাথাটা হারাতে চায় না কেউ। দ্বিতীয়ত অনেকের মনে ভেতরে ভেতরে কাজ করছে গুনাহের ভয়, দোযখের ভয়। এই মহলের কোনো টিকটিকিরও সাহস নেই মিজানীর

ইচ্ছার বিরুদ্ধে টিকটিক করে। তাঁর ছেলেমেয়ে নাতিপুতিদেরও সে সাহস নেই। অবশ্য ছেলেমেয়েদের কেউ এই বনে জঙ্গলে থাকেও না। কেবল দ্বিতীয় পক্ষের মেজো মেয়েটা বিধবা হয়ে এসে উঠেছে এ মহলে। সেই মেয়েটা এসেছিল কাল।

আব্বাজান নাকি আবার বিবাহ করবেন মনস্থ করেছেন?

নারে আম্মা? খোয়াবে আদেশ পাইছি। হুজুরপাকের আদেশ।

আমি কি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?

জ্বী আম্মা, পারেন। বলেন।

কেতাবে চারটা বিয়ার কথাই আছে। বলা হয়ে থাকে, তোমরা বিবাহ করিতে পারো একটি দুইটি তিনটি চারটি, যেমন তোমরা ইচ্ছা করো এবং তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত দাসীদের।

জ্বী আম্মা, আমি জানি।

এ বাড়িতে দাসীবান্দীর অভাব নাই। তাহলে আপনি বিবাহ করতেছেন কেন?

আম্মারে, এ হচ্ছে পলিটিক্স। শরিয়ত আর পলিটিক্স যখন এক সঙ্গে মেলে তখন অনেক কিছু করতে হয়। আমার কি সেই বয়স আছেরে মা, আমি দাসী–বান্দীরে নিয়ে ফুর্তি করবো? চোখে কম দেখি, কানে কম শুনি। কেবল আল্লাহর ইচ্ছা মানতেছি। এটা নিয়া প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।

মিজ্জানী ছাহেব খাদেম মোল্লাকে কাছে টেনে নেন। বলেন, উত্তম কাজ যতো তাড়াতাড়ি করা যায়, ততোই উত্তম। আজ সন্ধ্যাতেই নিকাহ পড়াও। কাজী ডাকো। তুমি এখন যাও। যাবার সময় গুলমোহরকে পাঠিয়ে দাও।

খাদেম মোল্লা একটু ইতস্তত করে। আজ রাতে শাদী পড়ানো যাবে কিনা তাই নিয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ আজ একটা বিচার শুরু করতে হবে। বদরিয়া বাহিনী একজনকে ধরে এনেছে। হুজুরপাককে তা বলা দরকার। এখনো বলা হয়নি। হুজুরের মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে শাদীর চিন্তা। অন্য কথা কানে ঢুকবে কিনা কে জানে?

হুজুর পাক আজ রাতে যে একটা মামলা ছিল। আসামী ধইরা আনা হইছে। বাইন্দা রাখা আছে। আজ রাতে কি তার বিচারে বসবেন নাকি শাদী করবেন?

মিজ্জানীও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। দুইটা কাজ। দুইটাই জরুরী। এক. নিকাহ করা। দুই. আসামীর ভাগ্য নির্ধারণ করা। তিনি বলেন, বিবাহ শাদীর মালিক আল্লাহ্। তিনি যদি চান, তবে আজ রাতেই শাদী হবে। তুমি আয়োজন করো। এখানেই শাদী হবে। পাত্রীকে এখানে নিয়া আসবা।

খাদেম মোল্লা বিদায় নেয়। যাবার আগে গুলমোহরকে খবর দেয়, হুজুরপাক ডেকেছেন তাকে।

গুলমোহর মিজ্জানীর কাছে আসে। তার ভ্রুর চুল নেড়ে দেয়। কান চুলকায়। তারপর বলে, হুজুরপাক বেয়াদবী না নিলে একটা কথা বলতাম।

বল, কি বলবি।

নিকাহ কি আইজ সন্ধ্যায় হবে?

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে হবে।

হুজুর, তয় একটা কথা। আমাগো বান্দীমহলে একটা ঘটনা ঘটছে। সেতারা বেগমের হাবভাব দেইখা মনে হইতেছে, পোয়াতী হইছে। কন তো দেখি কি ঝামেলা। সে তো কাম করে জেনানা মহলে। সেখানে কোনো বেগানা পুরুষ ঢুকতে পারে না। সে প্যাট বাজাইলো কেমনে?

হুজুরের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ও হুজুর আপনি ঘুমান কেন?

না, ঘুমাই নাই, জেগে আছি।

আমি কই কি, আপনে ওই সেতারারে শাদী করেন।

কি বলিস, চড় খাবি হারামজাদি। সে কোন মরদের কাছে গেছে, তারে জিগা। কঠিন শাস্তি। অর্ধেক মাটিতে পুঁতে....

হুজুর, মাথা ঠান্ডা করেন। এই মহলে পুরুষ বলতে কেবল আপনি।

মিজানী মুশকিলে পড়েন। তাঁর শরীর বার্ধক্যের আক্রমণে জরাজীর্ণ। রমণীর সঙ্গে কম্ম করার অবস্থা আজ অনেকদিন হলো নেই। এ বান্দী কি করেছে না করেছে তিনি জানেন না। তিনি কেন তার দায়িত্ব নেবেন? কিন্তু সে কথা কাউকে বলা যাবে না। তিনি যে এখনো যুবক, সেকথা প্রমাণ করার জন্যেই তো তিনি শাদী করতে যাচ্ছেন।

মাথাটা আবার গরম হয়ে ওঠে। তিনি আবার কাঁপতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে কাঁপতে থাকে তাকিয়াটাও। সিদ্ধান্ত নিতে হয় দ্রুত। দ্রুত এবং নিষ্ঠুর।

শেষরাতের দিকে সেতারা বেগম নামের এক পর্দানশীনা বাঁদী সাপের কামড়ে মারা যাবে।

তার আগে, সন্ধ্যায় বসবে নিকাহের আসর। কাজী আসবে। বলবে, অমুকের পুত্র অমুকের সঙ্গে অমুকের কন্যা মোসাম্মৎ অমুক বেগম...।

তিনি বলবেন, আল হামদুলিল্লাহ্।

মিজানীর হাত ক্রীড়াপরায়ণ হয়ে ওঠে।

আ, মরণ। অব্যয় ধ্বনি বেরোয় গুলমোহরের কণ্ঠ থেকে।



শফি ফিরছে না কেন? শফি ফিরছে না কেন? নাসিমা আকবরের চোখে ঘুম নেই। উদ্বেগে চোখ দুটো ঢুকে গেছে গর্তের ভেতরে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে সত্তুরে বৃদ্ধার মতো। তাঁর বয়স আসলে পঁয়তাল্লিশ ছোঁয়নি এখনো। নিঃসন্তান বলে শরীরের বাঁধনও আলগা নয়। একবার একজন জামাতিয়া তাঁকে দেখে বলেছিল, হুজুরাইনকে দেখলে বিবি খাদিজার কথা মনে পড়ে। হযরত (দঃ) পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের বিবি খাদিজাকে শাদী করেছিলেন। আল হামদুলিল্লাহ্। এই বিবিই প্রথম মহিলা মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাকে রহ্মত বর্ষণ করুন।

নাসিমা আকবর তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঘোমটা। হ্যাঁ, তখনো ঘোমটা ছিল এদেশে। শাড়ি ছিল বলে। চার পাঁচ বছর আগে এক জরুরী এলার্ন জারি হলো রেডিও-টিভিতে। এদেশের আওরত-জেনানারা আর শাড়ি পরতে পারবে না। কারণ শাড়ি হচ্ছে বেহায়া-বেশরমদের পোশাক। আব্রু ঢাকে না মোটেই। শয়তানের চেলারাই এ ধরনের পোশাক পরে থাকে। এটা আসলে হিন্দুস্তানের চক্রান্তের ফসল। হিন্দুয়ানি চালচলন এ মুলুকে চলবে না। সকল মহিলার জন্যে সেলোয়ার-কামিজ বাধ্যতামূলক। বাইরে বেরুলে উপরে অবশ্যই পরতে হবে বোরখা। তবে বাইরে বেরুনোটাও এতো সোজা নয়। অকারণে কোনো মহিলা ঘরের বাইরে যায় না। সাংঘাতিক কড়াকড়ি।

সেলোয়ার-কামিজ পরতে অবশ্য আপত্তি ছিল না নাসিমা আকবরের। আর্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। শফি আকবর ফিফথ ইয়ারে যখন, তখন। সব ধরনের পোশাকের প্রতি সমান আকর্ষণ বোধ করতেন তিনি, অথবা সমান অনাগ্রহ। পড়াটা আর শেষ হয়নি। তার আগেই লেগে গেলো দেশময় ইনকিলাবের আগুন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বিপ্লব বিপ্লব জামায়াতিয়া বিপ্লব। সে বিপ্লবের ঢেউ এসে পড়লো আর্ট ইন্সটিটিউটে। প্রাঙ্গণের ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলা হলো। ইয়া আলী! তারপর বদরিয়া শিবিরের লোকজন এলো ইন্সটিটিউটে। ঘোষণা করলো, কোনো মহিলা আর আসতে পারবে না ক্যাম্পাসে। দেশে যেখানে দশ লক্ষ শিক্ষিত যুবক বেকার সেখানে নারীশিক্ষা সরকারি অর্থের অপচয় মাত্র। বললো, আর্ট ইন্সটিটিউট খোলা থাকবে, তবে কেউই প্রাণীর ছবি আঁকতে পারবে না। কারণ হাশরের দিনে এইসব প্রাণীর ছবি দেখিয়ে বলা হবে, এসব প্রাণীতে জান দাও। জান দিতে না পারলে কঠিন আজাব। একটি ইনকিলাবী রাষ্ট্রে এ ধরনের কবীরা গুণাহের আয়োজন চোখের সামনে চলতে দেয়া যায় না।

নাসিমা আকবর টেবিলে ভাত সাজিয়ে বসে আছেন। রাত একটা বাজে প্রায়। নানা আশঙ্কায় তাঁর বুক ধড়পড় করছে। শফিতো কখনো এমন করে না। এশার আজানের আগেই ঘরে ফিরে আসে। আজানের পরে সমুদ্রের ধারে একা বসে থাকা নিরাপদ নয়। হেনস্থা করে পুলি। আর

বদরিয়া বাহিনীর লোকজনেরা। এখনো এদেশে তেমন কোনো আইন হয়নি যে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে, তবে সেই আইন হবে বলেই শোনা যাচ্ছে। চারদিকে প্রস্তুতি চলছে তারই। নামাজের সময় কাউকে একা বসে থাকলে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, পড়তে হয় নানা ধরনের হয়রানির মুখে। সেদিন টেলিভিশনে একজন জামায়াতি সেই বিষয়টাই বোঝাচ্ছিলেন। আল্লাহর আইনে যা ফরজ, এদেশের আইনেও তা ফরজ। সে সব অবশ্য কর্তব্য নাগরিকেরা সম্পাদন করছেন কিনা তা দেখাশোনার পবিত্র দায়িত্ব অবশ্যই ইনকিলাবী সরকারের। নামাজ যদি জামায়াতের সঙ্গে আদায় করা হয় তবে ২৭ গুণ বেশি সোয়াব। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত প্রত্যেক নাগরিকের জামায়াতে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির থাকে জামায়াতে, তবে তার জন্যে শাস্তির বিধান থাকা উচিত। এখনো অবশ্য সেই বিধান জারি করা হয়নি, তবে বদরিয়া-শিবির মানে না কোনো আইন-কানুন। তারা চলে তাদের মর্জি মতো। তুই আজ নামাজ পড়িসনি কেন- বলে যে কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পারে তারা। তারপর দেখাতে পারে কবরে আজাবের নমুনা।

রাত বাড়তে থাকে। দূর বনে শেয়াল ডাকে। সমস্ত জনপদ নিঃসাড়। শফি আকবর ফেরে না। ব্যাকুল হয়ে পড়েন নাসিমা। তাঁর চোখ ভেঙে আসে জল। তিনি শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। এতো রাতে কি করবেন, বুঝতে পারেন না। তাঁর পক্ষে একা কোথাও বেরোনো সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। বদরিয়া বাহিনীর হাতে পড়লে রক্ষা নেই। নারী-সংসর্গ বঞ্চিত এরা হয়ে আছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো। এতো রাতে একা একজন রমণীকে পেলে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে। তারপর টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে সমুদ্রের জলে। কেউ আর খোঁজটি পর্যন্ত জানবে না। কোনো চিহ্ন থাকবে না কোথাও।

চিহ্নহীন কতোজনই তো গেলো। আজো মনে পড়ে নাসিমা আকবরের। তার শৈশব থেকেই তিনি দেখে আসছেন, শুনে আসছেন এইসব চলে যাওয়া।

খাবার টেবিলে মাথা রাখেন নাসিমা। ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে। জীবনানন্দ দাশের পংক্তি। ছেলেবেলায় পড়া। এখন এসব কেউ পড়ে না। বিধর্মীদের লেখা পড়ে সমাজের মাথাটা যাতে খারাপ না হয়, সেই নিয়ে রাষ্ট্রের অপরিসীম মাথাব্যথা। এখন এদেশে নতুন কবি এসেছে। আল্লামা ইকবালের পুনরুত্থান হয়েছে। তার জন্ম-মৃত্যুদিবস পালিত হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। ছেলেবেলায় শুনেছিলেন, সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা। তিনি নাকি পাকিস্তানে এসেছিলেন থাকতে। বগুড়ার এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ইকবালের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। আর যায় কোথা। ঢিলের পরে ঢিল। মুজতবা আলীকে ফিরে যেতে হয়েছিল ভারতে। এখন সেই পাকিস্তান আমলের চেয়েও কঠিন দিন। এখন কেউ রবীন্দ্রনাথের নামও উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। টেবিলে মাথা রেখে এইসব ভাবেন নাসিমা।

এক ধূধূ প্রান্তর। আকাশে এক নিঃসঙ্গ চাঁদ। চারদিকে আর কিছু নেই। কিচ্ছুটি নয়। একা সেই প্রান্তরে হাঁটছেন নাসিমা। কিছু দূর যেতেই এক জলাভূমি। নিটোল জল। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে তার জল। জল দেখে তাঁর তৃষ্ণাবোধ হয়। তিনি হাঁটুজলে নেমে পড়েন। অঞ্জলি ভরে জল তুলে নেন উবু হয়ে।

আমাকে একটু পানি দাও। আমিও খুব পিপাসার্ত।

কে কথা বলে এ জনহীন প্রান্তরে? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন নাসিমা।

এই যে এদিকে আমি।

একটা হোগলা গাছের ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসে এই শব্দ।

সেদিকে এগিয়ে যান নাসিমা। দেখেন ঝোপের মধ্যে কাদার মধ্যে শুয়ে আছে একজন। মৃত।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসেন নাসিমা।

সেই মৃতদেহ নড়ে ওঠে। স্পষ্ট স্বরে বলে, আমাকে চিনলে না, আমি শহীদুল্লাহ কায়সার। বড়ই তৃষ্ণার্তরে মা। বড়ই তৃষ্ণার্ত। একটু পানি দেবে আমায়।

মৃতদেহ উঠে বসে।

নাসিমা আঁজলা ভরে পানি নিয়ে তার মুখে ধরেন। মৃত হাসে। বলে, বাংলার মাটি, বাংলার জল আজো বড় পুণ্যময়।

চলো, ওদিকটায় চলো। ওখানে আরো অনেককে দেখতে পাবে, যাদের দেহজুড়ে মাখামাখি হয়ে আছে বাংলার মাটি আর জল।

নাসিমা হাঁটতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সদ্য জলকাদা থেকে উঠে আসা শহীদুল্লাহ কায়সারের লাশ।

এগিয়ে যেতে থাকেন তারা। এই যে ইনি হচ্ছেন মুনীর চৌধুরী, এঁকে সালাম করো।

ইনি হচ্ছেন ডাঃ ফজলে রাব্বী। ডাক্তার মানুষ। তোমার নদীর জল কিন্তু ইনি খাবেন না। ইনি ডাক্তারিমতে বিশুদ্ধ পানি ছাড়া খান না।

অসংখ্য লাশ শুয়ে আছে আধা জলে। তাদের কারো নাম ডা: আলীম চৌধুরী, কারো নাম হাবিবুর রহমান। কারো বা রাশিদুল হাসান, জোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

সেই সব লাশ পেরিয়ে আরেকটা বাগান, লাশের বাগান।

সেখানে একেকটা বৃক্ষের নাম দেয়া হয়েছে একেকটা লাশের নামে।

একটা বকুল গাছের গায়ে নেমপ্লেট ঝুলছে 'শামসুর রাহমান'।

অসংখ্য গাছ, অসংখ্য নাম তাদের।

আহমদ শরীফ। জাহানারা ইমাম। কবীর চৌধুরী। সৈয়দ হাসান ইমাম। হুমায়ুন আজাদ। সৈয়দ শামসুল হক। শাহরিয়ার কবির।

একটা কলাগাছের গায়ে লেখা তসলিমা নাসরিন। একটা ছিপছিপে ফনিমনসার গায়ে লাল প্লেটে শাদা কালিতে লেখা শিশির ভট্টাচার্য।

শহীদুল্লাহ কায়সার বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন নাসিমা সব। এমন সময় রামদা হাতে এক ভয়ঙ্করদর্শন ব্যক্তি এসে দাঁড়ায় তাঁর সমানে। এই বাগান আমি রচনা করেছি। এর মালী আমি। সে তার হাতের নাঙ্গা তরবারি ঘোরাতে থাকে বনবন করে। নাসিমা তাকে একটুও ভয় পান না। জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?

আমার নাম আতিউর রহমান মিজানী। কর্মেই আমার পরিচয়।

এক কোপ বসায় সে, নাসিমার গর্দান বরাবর।

নাসিমা সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয়ে যায় একটি সুপারি গাছে।

ঘুম ভেঙে যায় নাসিমা আকবরের। খাবার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ভোর হয়ে গেছে।

শফি তো ফিরলো না।

কি করবেন এখন নাসিমা?

কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি। একটা বোরখা জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে, উন্মাদিনীপ্রায়।

কোথায় যাবেন তিনি, কার কাছে?

আসসালাতু খায়রুম মিনান্নাউম। ঘুম হইতে নামাজ উত্তম। আজান হয়।

একজন দুজন করে মুসল্লী বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। আপাদমস্তক আলখাল্লা অনেকের পরনে। তারা চলেছে মসজিদের দিকে।

মসজিদে যাবেন তিনি, নাসিমা সিদ্ধান্ত নেন। নামাজীদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা কেউ শফিকে দেখেছে কিনা। এই মসজিদের ইমাম পদাধিকার বলেই এই মহল্লার প্রধান। নাসিমা যাবেন তার কাছে, খোঁজ করবেন তাঁর স্বামীর, পরামর্শ চাইবেন তাঁর কাছে।

নাসিমা মসজিদের দাওয়ায় এসে পৌছান। ভেতরে নামাজ হচ্ছে। হৌজের পাশে ওজুর পিঁড়িতে বসে পড়েন তিনি। বোরখায় ঢাকা এই মানুষটিকে আলো–অন্ধকারে মনে হয় অশরীরী কেউ।

আসসালামু আলায়কুম ওয়ারহমতুল্লাহ। নামাজ শেষ হয়। আল্লাহুমা আমিন। মোনাজাত হচ্ছে।

বাইরে থেকে নাসিমা সব শুনতে পান।

যে দোয়া দরুদ পঠিত হয়েছে, তার সোয়াব বখশে দেয়া হচ্ছে আল্লাহর নবী মুহম্মদ (দঃ)–এর নামে। নাসিমা আপন মনেই পাঠ করেন দরুদ। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর মনটা নরম হয়ে পড়েছে সহজেই। আল্লাহ–রসুলের কাছে নত হয়ে পড়েছে তাঁর অন্তর। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, হে রাসুল পাক (দঃ), আমার স্বামীকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

এবার সোয়াব বখশে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন অলিআল্লাহর নামে। মোনাজাত দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

ভেতর থেকে ভেসে আসছে, এর সোয়াব পাকমুলুকের নেতা হযরত মহুদুদীর নামে পৌছানো হোক। গুল–মে–আযমের নামে পৌছানো হোক। মতিউর রহমান মিজানীর নামে পৌছানো হোক। পৌছানো হোক হযরত সাব্বাস আলী খানের রুহের ওপরে।

নাসিমার কান গরম হয়ে ওঠে, চক্ষু জ্বালাময়। তিনি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন ওজুর পিঁড়িটিতে।

ততোক্ষণে নামাজ শেষ হয়ে গেছে। নামাজীরা বেরিয়ে আসে একে একে।

ভাই, আসসালামু আলায়কুম। কিছুটা উত্তেজনায়, কিছুটা প্রিয়জন হারানোর বিহ্বলতায় নাসিমার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়।

একজন নামাজী তাঁর দিকে তাকায়। ওয়ালাইকুম পর্যন্ত বলতে পারে সে। এই সুবহে সাদিকের সময়ে মসজিদের দাওয়ায় নারীকণ্ঠ শুনে আঁতকে ওঠে, তারপর অতিদ্রুত পা চালিয়ে কেটে পড়ে সে।

তারপর আরেকজন।

আসসালামু আলায়কুম।

ওয়া–এ–এ–এ্যা। অদ্ভুত একটা শব্দ বেরোয় তার কণ্ঠ থেকে। সে দৌড়ুতে শুরু করে পড়িমরি।

এরপর এক ঝাঁক মুসুল্লী। হঠাৎ একজনকে দৌড়ুতে দেখে, তার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে এবং একটি দীর্ঘকালো ছায়া থেকে অর্ধমানব–অর্ধমানবীর কণ্ঠ নিঃসৃত হতে শুনে তারা আর্তনাদ করে ওঠে। শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা।

জ্বীনের আছর পড়েছে, জ্বীনের আছড়। বলে কেউ কেউ।

মুহূর্তে ময়দান ফাঁকা। বেশ কিছু স্যান্ডেল আর জুতা পড়ে থাকে মসজিদ চত্বরে।

মাথা ঘুরতে থাকে নাসিমার। মনে হয়, একশ প্রেতিনী নাচছে তাঁকে ঘিরে। কোত্থেকে ঢিল এসে পড়তে থাকে আশেপাশে। একটা ঢিল এসে পড়ে তাঁর পিঠে।

বিচিত্র শব্দ হয় চারদিকে।

তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পড়ে থাকেন মসজিদ চত্বরে।

দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে কতিপয় অসমসাহসী মুসল্লী। কিন্তু তাদের চোখের সামনে অশরীরীর নৃত্য শেষ হয় না। অসংখ্য মৃতদেহ কাফনের কাপড় পরে মিছিল করে আসে মসজিদ প্রাঙ্গণে।

দোয়া ইউনুস পড়ে সেই মুসল্লীরা।

কিন্তু ভয় তাদের ত্যাগ করে না।

যথারীতি সূর্য ওঠে কিংবা ওঠে না। চারদিক ফর্শা হয়, কিংবা আরো একরাশ অন্ধকার উগড়ে দেয় অদৃশ্য দোয়াত। পাখি ডাকে কিংবা কলরব করে ওঠে জ্বীনের মেয়েরা।

যে অন্ধকার নেমে এসেছে এই মুলুকে, তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াইয়ে নামে আরেকটা দিবসের সূর্য।

সেই সূর্যের নিচে একটি মানবীর শরীর পড়ে থাকে অচেতনভাবে।



যেন অনন্তকাল বসে আছেন তিনি অন্ধকারে, হাঁটুতে মাথা রেখে। সময় বয়ে যাচ্ছে, কালখণ্ডের পর কালখন্ড, তিনি টের পাচ্ছেন না, কিংবা এক অখণ্ড সময়ের পাথরের ওপর বসা তিনি। না দিবস, না রাত্রি। শুধু অন্ধকার।

চড়ুই পাখির সমান একেকটি মশা। ঘুর ঘুর করছে চারপাশে তাঁর, শফি আকবরের।

একটা মশা এসে বসে তাঁর বাঁ পায়ে। তিনি হাত দিয়ে ধরে ফেলেন সেটিকে। এতো মোটাসোটা যে নড়তেও পারে না। মশাটিকে ডান হাতে ধরে আস্তে করে নিক্ষেপ করেন তিনি বাম দিকে।

চোখ তুলে তাকান শফি আকবর, কতোদূরে পড়লো মশাটা। প্রায়ান্ধকার ঘরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরো কয়েকজন। সবাই ঘুমিয়ে। অনেক রাত হবে এখন।

নাসিমা কি করছে এখন? কোথায় সে? কতোদিন দেখি না তাকে? কতো দিন? শফি হিসেব করতে পারেন না। সময় হিসেব করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। চারদিক থেকে ভেসে আসছে বিচিত্রসব আওয়াজ। বন্য পশুপাখির নানা কলরব। শেয়াল ডাকছে। ঝিঁঝি। মাঝে মধ্যে প্যাঁচার ডাক।

ঘন অন্ধকারে থাকতে থাকতে শফির চোখ এক ধরনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। তুমুল তমসা ভেদ করেও খানিকটা দেখতে পান তিনি। অন্ধকার সয়ে যায় চোখে। এই ঘরটির অনেককিছু এখন দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

তাঁর বাঁপাশে শুয়ে আছে ইয়াকুব। তেরো– চোদ্দো বছরের এক নিষ্পাপ কিশোর। তাকে ধরে আনা হয়েছে গতকাল। তার অপরাধ সে ফুটবল খেলছিল।

ফুটবল? এদেশে ফুটবল পেলে কোথায়?

ফুটবল মানে জাম্বুরা। জাম্বুরায় লাথি মারছিলাম। আমি আর আমার ছোটভাই। বদরিয়া বাহিনীর লোক দেখে ভাইটি আগেই পালিয়েছে। আমি পালাইনি। ভেবেছি কিছু বলবে না। আমাকে ধরে এনেছে।

ফুটবল খেলতে গেলে কেন তুমি?

আমার দাদু বলেন, এ হচ্ছে রক্তের টান। আমার দাদু খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। আমার বাবাও ভালো খেলতেন। বাবা ছিলেন রাইট ব্যাক। পরে ইনজুরড হয়ে যাওয়ায় আর খেলেননি।

কোন দলে খেলতেন তোমার দাদু।

মোহামেডানে।

এ পর্যন্তই কথা হয়েছিল ইয়াকুবের সঙ্গে। কাল বিকেলে। এর বেশি কিছু কথা বলা যায়নি।

বদরিয়া বাহিনীর লোকেরা এসে ধমকে দিয়েছিল। খামোশ। সাংঘাতিক ধমক। সে ধমকে সদ্য উচ্চারিত 'মোহামেডান' শব্দটিও যেন ভেঙেচুরে দলেমলে গিয়েছিল।

বছর কয়েক হলো এদেশে খেলাধুলা হারাম। জামাতিয়া আইনে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। কিতাবে আছে, তিনপ্রকার খেলা ব্যতীত সকলপ্রকার খেলা হারাম। এই তিনপ্রকার খেলা হলো, অশ্বচালনা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তীর ধনুক চালনা এবং দাম্পত্য ক্রীড়া। জামাতিয়া আইনবিশারদরা এই নিয়মের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, অশ্বচালনা কিংবা তীরধনুক চালনা ছিল সেই যুগের ব্যাপার। এর বদলে এখন গাড়ি চালনা করা যাবে। আর তীরধনুকের বদলে রামদা–তরবারী–মেশিনগান–ট্যাঙ্ক–কামান সবই চালানো হালাল। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এসব অস্ত্র যেন ব্যবহার করা হয় ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে, কাফেরদের বিরুদ্ধে, ইহুদী–নাসারা–মালাউনদের বিরুদ্ধে।

স্টেডিয়ামগুলো এখন এইসব কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কিভাবে রগকাটতে হয়, কিভাবে শিনা বরাবর কোপ মারতে হয়, কিভাবে কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে ঘর থেকে ধরে আনতে হয় ভিন্নমতাবলম্বীদের, তারই মহড়া দেয়া হয় এখন স্টেডিয়ামগুলোতে। খেলাধুলা বিষয়টিই এখন এক মৃত অতীত। এমনকি টেলিভিশনেও কেউ দেখতে পারে না ক্রিকেট, ফুটবল, অলিম্পিক। ডিশ এন্টেনা নিষিদ্ধ এদেশে। বাইরের দুনিয়ার কুফরী মতবাদ আর শয়তানী ফিকির যেন কিছুতেই ঢুকতে না পারে।

আবার একটি মশা। শফি অপেক্ষা করেন সেটি বসুক তার গায়ে। এবার তিনি জোরে ঠেসে ধরবেন মশাটিকে। পুরা জেহাদী মশা। জামাতিয়া হবে। কানের কাছে শিঙগা বাজাচ্ছে কিন্তু বসছে না। এই ঘরটি বদরিয়া বাহিনীর নিজস্ব হাজতখানা হবে। প্রশাসনিক থানার হাজতখানা যে নয়, তা স্পষ্ট। এখানে তাঁকে রাখা হয়েছে কেন, বোঝা মুশকিল। তাঁকে সেদিন যারা আটক করেছিল সমুদ্রপাড় থেকে, তাদের কথাবার্তা থেকে মনে হয়েছে, তাঁর বিচার হবে। বিচার হবে জামাতিয়া আদালতে।

জামাতিয়া আদালত?

মশাটা তাঁর কানের কাছে বসে। ডান হাতে সেটাকে ধরে বাঁ হাতে পাখা দুটো ছেঁড়েন শফি, আনমনে। তারপর ছুঁড়ে ফেলেন দূরে। কাজটি করেন নীরবে এবং গোপনে; আর অন্যমনস্কভাবে, কেউ তাকে দেখে না, তিনিও মনোসংযোগ করেন না তেমন। কেননা মন তার তখন খুঁজে চলে তার চাচা আবদুস সবুরের মুখ।

তখন তিনি ছোট, বয়স পাঁচ কিংবা ছয় হবে। কেবল স্কুলে যান, পড়েন অ আ ক খ। একদিন শোনেন, তার সবুর চাচাকে দেখতে যেতে হবে, হাসপাতালে। কার সঙ্গে মনে নেই, হয়তো বাবার সঙ্গে, হাসপাতালে যান শফি আকবর। ওয়ার্ডে সারি সারি বেড। একটিতে শুয়ে আছেন তার সবুর চাচা। ডানহাতটি ব্যান্ডেজ বাধা। মনে হয় যে, হাতের পাঞ্জাটি নেই। চাচা, তোমার হাত কোথায়?

ওই যে বাবা, ওখানে।

একটু দূরে, একটা টেবিলের ওপরে একটা শাদা পাত্রে পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত হাত। পাঁচটি আঙুল সমেত। কব্জি পর্যন্ত। চিৎকার করে ওঠেন বালক শফি আকবর। কে কেটেছে ওই হাত? পরে শুনেছেন, শিবিরের লোক। বদরিয়া শিবির। তাদের জামাতিয়া আদালতে নাকি বিচার বসেছিল তার সবুর চাচার। সেই বিচারে তার শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল হাত কাটা। তাই কার্যকর করেছে শিবিরের লোকেরা।

সেই বার প্রথম নাম শুনেছিলেন শফি আকবর জামাতিয়া আদালতের। তারপর কতোজনই তো গেলো!

আশপাশে সবাই ঘুমিয়ে। কে যে কতোদিন হলো আটক এই হাজতে, কে জানে? কার যে কি অপরাধ? শফি আকবরের হাম্মামখানায় যাওয়া দরকার। কিন্তু কোমরে দড়ি। দেয়ালে কলিং বেল আছে। তিনি তাতে চাপ দেন। রাইফেল কাঁধে একজন লোক আসে। তার চোখ ঢুলুঢুলু। মহাবিরক্তিভরে সে শফি আকবরের কোমরের বাঁধন খুলে দেয়। শফি আকবর অতিকষ্টে ওঠেন।

শৌচাগারটি একটু দূরে। একটা বারান্দামতো পেরুতে হয়।

শরিয়ত মতো কাজ করবা। শরিয়ত মতো। পায়খানায় প্রবেশের দোয়া জানো? না, জানলেও ক্ষতি নেই। আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, তিনি যেন শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন। কি, বুঝলা?

জ্বী বুঝেছি।

আউযুবিল্লাহ হিমিনাশ শাইতুয়ানের রাজিম বললেও চলবে। তবে কুলুক ঠিকভাবে নিবা।

জ্বী আচ্ছা।

হাম্মামখানার মধ্যে মাটির ঢেলা আছে। চল্লিশ কদম হাঁটবা। আমি বাইরে পাহারা আছি। শরিয়তবিরোধী কোনো কিছু হতে দিবো না। বুঝেছো?

জ্বী, আচ্ছা।

শফি আকবর শৌচাগারে ঢুকে পড়েন। বদরিয়া বাহিনীর লোকটি বাইরে পায়চারী করে। অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করে, হে আল্লাহ শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে আমাকে রক্ষা করো।

আল্লাহতালা তার মোনাজাত মঞ্জুর করেন না। অচিরেই শয়তান এসে ভর করে তার মাথায়। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাম্মামখানার দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। ধীর পায়ে এগুতে থাকে হাজতখানার দিকে। তার বুক ধুপধুপ করে কাঁপে। সে ইয়াকুবের কাছে যায়। তাকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে তোলে ঘুম থেকে। বলে একটু পরে আজান দেবে। ঘুম থেকে ওঠো। আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম। কাজ-কর্ম সারো। মিসওয়াক করো। ওজু করো। ওঠো। কোমরের দড়ি খুলে ইয়াকুবকে সে নিয়ে আসে একটা ছোট্ট ঘরে। ভেতর থেকে দরজা আটকে দেয় এই কর্মীটি। ইয়াকুব ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারে না কিছুই। বদরিয়া কর্মীটি তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, ইয়াকুব, তুমি কি ফুটবল খেলতে চাও? আমি তোমাকে ফুটবল কিনে দেবো।

আলিঙ্গন আরো গাঢ় হয়। ইয়াকুবের মুখের মধ্যে ঢুকে যায় কর্মীটির লালাময় জিভ।

ইয়াকুব কি করবে বুঝতে পারে না।

ইয়াকুব, তুমি চিৎকার করবে না। আমি এখন তোমাকে আদর করবো। যদি তুমি আমার আদর নাও, তবে তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো। আর যদি চিৎকার করো তবে এই ছুরি দিয়ে তোমার দুই চোখ তুলে ফেলবো। জিভ কেটে ফেলবো।

কর্মীটির শ্বাস গরম আর দ্রুত হয়। সে পড়তে থাকে, আউযুবিল্লাহ হিমিনাশশাইতুয়ানের রাজিম।

শফি আকবর বাথরুম থেকে বেরুবেন, কিন্তু দরোজা বাইরে থেকে বন্ধ। কুলুক করার জন্যে চল্লিশ কদম হাঁটার মতো একটা পরিসর আছে এখানে। তিনি সেখানে পায়চারী করেন খানিকক্ষণ। তারপর দরোজায় ধাক্কা দেন। দরোজা কেউ খুলছে না দেখে শুরু করেন চেঁচামেচি।

খানিকক্ষণ পর দরোজা খুলে দেয়া হয়।

এতো চেঁচামেচির কি আছে? হাগামোতা করার পর ওজু গোসল করা উত্তম। করেছো?

শফি হাজতখানায় তাঁর জায়গায় ফিরে আসেন। সৈনিকটি তাঁকে আবার বেঁধে ফেলে। তারপর চলে যায়।

নীরবতা নেমে আসে এই কক্ষটিতে। আশপাশে সবাই ঘুমুচ্ছে। কেবল শফি জেগে। তাঁর চোখে ঘুম নেই। তাঁর বারবার মনে পড়ে নাসিমার কথা। নাসিমা কি করছে এখন? কি খাচ্ছে? বাজার করে দিচ্ছে কে? নাকি তার চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে সে?

বড় অধীরা সে, নাসিমা। আর ভয়ানক ভীতু। শফি আকবর আর্ট ইন্সটিটিউটে পড়তেন যখন, তখন খুব ভালো হাত ছিল তাঁর কার্টুন আঁকার। কার্টুনে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন ভণ্ডরাজনীতিক আর রাজাকারদের পাশবিক মুখ। এশিয়ান সোসাইটি অফ কার্টুনিস্টস–এর দেয়া একটা স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নাসিমা চাইতেন না তিনি কার্টুন আঁকেন। বলতেন, তুমি পেইন্টিং করো। তোমার মতো এতো বড়ো প্রতিভা কেন তুমি অপচয় করবে কার্টুন এঁকে?

নাসিমার এই পরামর্শে যেমন ছিল শফি আকবরকে বড়ো পেইন্টার হিসেবে দেখার বাসনা, তেমনি ভয় ছিল তাঁকে নিয়ে। কার্টুন আঁকা কোনো নির্বিরোধ শিল্পকর্ম নয়। বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতো, তাদের জন্যে বিপদ ছিল চতুর্মুখী। একবার একটা চিঠি এলো এরকম : ভাইজান শফি আকবর সালাম লইবেন। আপনি যেসব কার্টুন আঁকিতেছেন, তাহা আমরা একটি ফাইলে জমা রাখিতেছি। আপনি আমাদের নেতাকে লইয়া এ যাবৎ কাল ৩৩টি কার্টুন আঁকিয়াছেন। কার্টুনগুলার উপযুক্ত মূল্য আপনি লাভ করিবেন। আপনার আঙ্গুল হইতে নখ এবং আপনার চক্ষু হইতে পাতা তুলিয়া দিয়া আপনার মূল্য শোধ করিবো। আশা করি, এই পত্র পাইবার পর আপনি হেদায়েৎ হইয়া যাইবেন। না হইলে বুঝিতেই পারিতেছেন। ইত্যাদি।

এই চিঠি পৌঁছেছিল নাসিমার হাতে। নাসিমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। চোখে মুখে পানি দিয়েও লাভ হয়নি। শেষে নিতে হয়েছিল হাসপাতালে। ফেরার পর তার প্রথম কথা ছিল, শফি আমার মাথায় হাত রাখো। এবার বলো, তুমি আর কোনোদিন কার্টুন আঁকবে না।

উঁ–উঁ–উঁ। কান্নার শব্দ। চমকে ওঠেন শফি। কে কাঁদে? তাকান এদিক সেদিক। টের পান অচিরেই, ইয়াকুব কাঁদছে।

কি হয়েছে ইয়াকুব, খারাপ লাগছে?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আসে না। চিকন সুরে ইয়াকুব কাঁদতেই থাকে।

কেঁদো না ইয়াকুব। আমি তো তোমার পাশেই আছি। কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। তাছাড়া তুমি বাচ্চা ছেলে, তোমাকে নিশ্চয়ই কাল সকালে ছেড়ে দেবে।

ইয়াকুব হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, আমি বাসায় ফিরে যাবো না।

শফি আকবরের মনটা ভিজে ওঠে। আহা, তেরো চোদ্দো বছরের একটা ছেলে। যদি তাঁর ছেলেটা বেঁচে থাকতো তবে তার বয়স কতো হতো! আঠারো উনিশ!

খুব ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছিল তাঁর। সবাই বলেছিল, দেখতে হয়েছে বাবার মতো। চব্বিশ ঘন্টা বেঁচেছিল শিশুটি। তারপর মারা গেছে। শ্বাসবন্ধ হয়ে গিয়ে। জেনিটাল প্রবলেম। পরে আর কোনো সন্তান নেননি তাঁরা। ডাক্তার বলে দিয়েছিল বাঁচবে না।

ইয়াকুবের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শফি। বাৎসল্য রসে তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে। ছেলেটি দুইহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। মশা কামড়াচ্ছে তাকে, সেদিকে খেয়াল নেই তার। দূরাগত অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পান, একটি মশা বসেছে ইয়াকুবের কনুইয়ে। শফি মশাটা তাড়িয়ে দেবেন বলে উঠে পড়েন। কোমরের দড়িতে টান পড়ে। উঠতে পারেন না।

কলিং বেলে চাপ দেন। সেই বদরিয়া বাহিনীর লোকটা।

ভীষণ কাঁদছে ছেলেটা। মনে হয় মশা কামড়াচ্ছে। একটু কাছে যাও তো, দ্যাখো, কাঁদছে কেন।

বদরিয়া লোকটি ইয়াকুবের কাছে যায়। হাঁটু গেড়ে বসে। ফিসফিস করে বলে, খবরদার কাঁদবে না। চামড়া কেটে লবণ লাগিয়ে দেবো।

ইয়াকুব মাথা তোলে। তাকায় কর্মীটির দিকে। তারপর এক গাদা থুতু ছুঁড়ে দেয় ওই লোকটির মুখে।

লোকটি উঠে পড়ে। এক লাথি বসায় ইয়াকুবের মাথায়। কুত্তার বাচ্চা, গালি দেয় ইয়াকুব। চলে যায় লোকটি।

বাইরে আজান হয়। ফজরের আজান। আরেকটি রাত কেটে গেলো তাহলে, শফি ভাবেন। আজ তাঁর বিচার হবার কথা জামাতিয়া আদালতে। তাতে তাঁকে উপস্থিত করা হবে কিনা কে জানে। এর আগে এক রাতে বাদ এশা তাঁর মামলা শুরু হবার কথা ছিল। হয়নি। মিজানী ছাহেব সে রাতে আসতে পারেননি। তাঁর অন্য ব্যস্ততা ছিল।

আজ সকালে তাঁর বিচার বসতে পারে, তিনি শুনেছেন। হলে তো ভালোই। জামাতিয়া আদালতের বিচার দীর্ঘসূত্রিতাময় হবার কথা নয়। বছরের পর বছর লাগবে, এমন মনে হয় না। কারণ এদের কোনো জেলখানা নেই। কয়েদখানা আছে সরকারের। তার যে বিচার হচ্ছে ,এটি সরকারি আদালতে নয়। জামাতিয়া আদালতে। এটি একটি রাজনৈতিক বিচার। তাঁর অপরাধটি রাজনৈতিক। প্রথমত তিনি গান গেয়েছেন। গান গাওয়া একটি হারাম কর্ম। কেতাবে আছে, কোনো ব্যক্তি যখন গান গায় তখন শয়তান তাহার পদদ্বয় দ্বারা ওই ব্যক্তির মস্তক নাড়িতে থাকে। গানগাওয়া হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ শয়তানি কাজ। এদেশে কেউ গান গায় না। রেডিওতে না, টিভিতে না। ইনকিলাবের সময় বহু শিল্পীকে হত্যা করা হয়েছে। ঢোল-তবলা-হারমনিয়ম-ড্রাম-বেহালা ইত্যাদি জড়ো করে করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বহু শিল্পী দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত তিনি যে গানটি গেয়েছেন তা এক মালাউনের লেখা। এটাকে মনে করা হচ্ছে হিন্দুস্তানের চক্রান্ত। দ্বিতীয় কারণেই তার বিচার সরকারি আদালতে না করে জামাতিয়া আদালতে করা হচ্ছে। এরা খোঁজ-খবর করে বের করতে চায়, ইনকিলাববিরোধী কোনো রাজনীতি এই গানের সঙ্গে রয়েছে কিনা।

বদরিয়া বাহিনীর দুজন কর্মী আসে শফি আকবরের কাছে।

তোমাকে একটু আমাদের সাথে যেতে হবে।

কোথায়?

শ্বশুরবাড়ি। সেখানে তোমাকে জামাই আদর করা হবে। তিনজন শ্যালিকার সঙ্গে একই বিছানায় শুতে হবে তোমাকে, একই সঙ্গে। শুয়োরের বাচ্চা। হিন্দুস্তানের দালাল কোথাকার।



চিকন সুরে কে যেন কাঁদছে, মনে হয়, দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসছে কোনো শতাব্দীপ্রাচীন রাখালিয়া বাঁশির সুর। সুর–নিষিদ্ধ এই দেশে চেতনা আর অবচেতনের মধ্যবর্তী স্তর থেকে জেগে ওঠেন নাসিমা আকবর।

তিনি শুয়ে আছেন একটা ঘরে, প্রায়ান্ধকার ঘর; কিন্তু আরো গাঢ়তর অন্ধকার থেকে আসার ফলে সে অন্ধকারও স্বচ্ছ মনে হয় নাসিমার কাছে। তিনি দেখতে পান, শুয়ে আছেন তিনি, একটি বিছানায়। ঘরটি কাঠের, ফাঁকা।

কান্নার শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে।

তিনি উঠে বসেন বিছানায়। কষ্ট হয় তাঁর।

মনে পড়ে, শফি আকবরকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তিনি, গিয়েছিলেন মসজিদের দাওয়ায়। এই পর্যন্তই মনে পড়ে তাঁর, তারপর অন্ধকার।

শফি এখন কোথায়?

তিনি নিজেই বা এখন কোথায়?

বিছানা থেকে নামেন নাসিমা, পা রাখেন কাঠের মেঝেতে।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ তাঁকে টানে, তিনি সেই ঘরের দিকে পা বাড়ান।

দেখেন, জায়নামাজে বসে একজন মহিলা কাঁদছেন। তার বয়স বছর ত্রিশেক হবে।

নাসিমা দরোজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। তাঁর ছায়া প্রলম্বিত হয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়।

ক্রন্দনরতা মহিলাটি ঘুরে তাকান। আপনার হুঁশ ফিরে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌। তাঁর গন্ডদ্বয়ে জল চিকচিক করে। চোখের কোণে এক রাশ কালি।

আপনি হুঁশ ফিরে পেলেন, কিন্তু আমি তো ফিরে পাচ্ছি না। তিনি জায়নামাজ থেকে ওঠেন।

নাসিমা কি করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর নিজের মনেই অনেক উদ্বেগ, অনেক উৎকণ্ঠা, শরীরে নানা ধকল। এদিকে আরেকজন দুঃখিনী তাঁর সামনে।

নানা মানুষের মনে নানা ধরনের দুঃখ, কিন্তু অশ্রুর বর্ণ আর ভাষা অভিন্ন।

তোমার কি হয়েছে, বোন। জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন নাসিমা।

ডুকরে কেঁদে ওঠেন মহিলাটি। কাঁদতেই থাকেন, কাঁদতেই থাকেন।

নাসিমা তার কাছে যান। দু'জন হাত ধরাধরি করে বসেন।

আপা! মুখ খোলে মহিলাটি। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার একরত্তি একটা মেয়ে। নাফিজা। জোর করে নিয়ে গেছে তাকে।

কারা নিয়ে গেছে, কোথায়?

মিজানীমহলে। মিজানী ছাহেবের সঙ্গে শাদী হয়ে গেছে।

সব মেয়েকেই একদিন চলে যেতে হয় স্বামীর গৃহে। আপনি এতোটা অধীর হচ্ছেন কেন?

মহিলার কান্না আর বিলাপের মাত্রা যায় বেড়ে। তিনি বলেন, আমার মেয়ে এখনো নাবালিকা। এবার বারোয় পড়বে। নাফিজার এখনো হায়েজ-নেফাজ হয়নি। ওকে আমি সাতটুকরো করে কেন পানিতে ভাসিয়ে দিলাম না? মিজানী একটা শকুন। বয়স কম সে কম একশো বছর।

এই বিয়েতে বুঝি আপনার মত ছিল না?

না। একদমই না। ওর বাবা জোর করে দিয়েছে। আমাকে বলেছে, সোয়াব হবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছ থেকে শিক্ষা নাও। খলিফা আবু বকর (রা:) তার সাত বছরের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি স্বামীর ঘরে গিয়েছিলেন। হায়াৎ-মউত-রিজক-দৌলত-জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে আল্লাহ্র হাতে। সবি আল্লাহ্র ইচ্ছা।

নাফিজার মা কেঁদেই চলেন। নাসিমা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। কিই বা বলার আছে?

তবে এই মহিলার কাছে সবচেয়ে দরকারি তথ্যটা তিনি পেয়ে যান। তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে মিজানীর লোকেরাই। তাঁর বিচার হবে জামাতিয়া আদালতে।

মিজানী সম্পর্কে মহিলার জামাতা। নতুন পাতা বৈবাহিক সম্পর্ক। সেই সূত্রে হয়তো শফি আকবরের সঙ্গে নাসিমার দেখা করিয়ে দিতে পারেন এই মহিলা। হয়তো চাইলে তাঁর মুক্তিরও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। নাফিজার মা মহিলাটি ভালো। খুবই নরম হৃদয় তাঁর। মসজিদের দাওয়ায় একজন মহিলা পড়ে আছে শুনে তিনিই নাসিমাকে উদ্ধার করেছেন। তিনজন দাসী সমেত গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছেন। মসজিদের পাশেই তার বাসা। তার স্বামী এই মসজিদেরই একজন খাদেম। নাম আবদুল হাফিজ।

এসব গল্প হয় দুই মহিলার। দু'জনের বুকে দুই রকমের দুঃখ। একজনের স্বামী নিখোঁজ। আরেক জনের শিশুকন্যাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে কুরবানীর ছুরির নিচে। ঠিক হয়, তারা দু'জনই যাবেন মিজানী মহলে। একজন দেখতে যাবেন তাঁর কন্যাকে, আরেকজন তাঁর স্বামীকে। যদি দেখা পাওয়া যায় আদৌ!

মিজানীর মনটা আজ ভালো, বলা যায়, ফুরফুরে। কাল রাত ছিল তাঁর বাসর রাত। তৃতীয় বাসর। বাসর রাতটি নিয়ে তার বুকে সংশয় ছিল, ছিল নানা উৎকণ্ঠা। কি করবেন তিনি বাসরে?

ভালোয় ভালোয় পার করেছেন তিনি গত রাতটি।

বাসর রাতে প্রবেশ করে দেখতে পান, সমস্ত দেহ ওড়নায় ঢেকে বসে আছে এক বালিকা। বালিকা-বধূ তাঁর।

তাঁর বুক টিপটিপ করতে থাকে। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। মনে হয় তিনি পৌছতে পারবেন না বিছানা পর্যন্ত। কিন্তু জেহাদী জোশ তাঁকে ঠেলে দেয় বিছানা পর্যন্ত।

তিনি বিছানায় গিয়ে বসেন।

মেয়েটি নীরব থাকে।

তিনি বলেন, বিবি, সালাম দাও। বলো, আসসালামু আলাইকুম। নিয়ম এই, ছোট বড়কে, বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তিকে সালাম দেবে।

মেয়েটি নীরব থাকে।

তিনি তার ওড়নাটি সরান। মুখের দিকে তাকান। এই বয়সে দেখতে একটু কষ্ট হয় বৈকি, কিন্তু তাঁর নয়া বিবির দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ভরে ওঠে। আলহামদুলিল্লাহ।

রাত বাড়ে, মেয়েটির চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। অল্প বয়স। অল্প বয়সে চোখে ঘুম থাকে বেশি। বয়স

বাড়লে ঘুম আসে কমে।

মেয়েটি এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। মিজানীর চোখে ঘুম নেই। বুক কাঁপে। এই বিয়েটার পেছনে আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই বিয়ে তাঁর শারীরিক সক্ষমতার প্রমাণ। তিনি এই এলাকার জামাতিয়া আদালতের প্রধান থাকবেন কিনা তার পরীক্ষা।

বিছানায় শাদা চাদর বিছানো। এই চাদর আগামী প্রভাতে সাক্ষ্য দেবে নয়া বিবির সতীত্বের আর তাঁর তাক্‌দের।

তিনি একটা ছোট চাকু বের করেন বিছানার গদির নিচ থেকে। নিতান্তই সাধারণ চাকু। পেন্সিল কাটা। ধার নেই তেমন। স্টেইনলেস স্টিলের।

মিজানীর হাত কাঁপতে থাকে। এখন শরীরে দরকার শক্তি, মনে জোর।

তিনি মনে করতে চেষ্টা করনে ঊনিশশত একাত্তর সালের কথা। তার নির্দেশ মাফিক হচ্ছে সব কিছু। বদরিয়া বাহিনীর ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছে জীপ নিয়ে। তালিকা অনুযায়ী হচ্ছে সব কিছু। সবাইকে আনা হচ্ছে ডোবার ধারে, জলা–জংলাময় জায়গায়। চোখ বাঁধা। কারোটা শাল দিয়ে, কারোটা মাফলারে।

কাউকে কাউকে গুলি করা হচ্ছে। একজন প্রফেসরের ওপর তাঁর রাগ ছিল খুবই। কমিউনিস্ট। হিন্দুস্তানের দালাল। তিনি ঠিক করলেন, এই পাপিষ্ঠকে মারবেন নিজ হাতে। একটা ছুরি তুলে নিলেন হাতে।

হ্যাঁ, এই তো, তিনি আবার ফিরে পাচ্ছেন যৌবনের সেই তাক্‌দ।

নাফিজার পায়জামার ফিতে খোলার ধৈর্য থাকে না তার। ছুরির ডগায় তা কেটে যায় সহজেই।

নাফিজা তখন ঘুমিয়ে।

আবছা অন্ধকার।

হঠাৎ চিৎকার। মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে এক রক্তলাল বিদ্যুৎরেখা একবার ওঠে ঝিলিক দিয়ে।

হুঁশ হারায় নাফিজা।

আলহামদুলিল্লাহ। সব কাজ সমাধা হয় নির্ঝঞ্ঝাট।

সকাল বেলা জ্ঞান ফিরে এসেছে নয়া বিবির। একটু ব্যথাকাতর তার মুখাবয়ব। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, সব কিছু। জানেন মিজানী। মেয়েরা সব পারে।

বিছানায় শুয়ে আছে নাফিজা। মিজানীর বাঁদীরা তাকে গোসল করিয়ে নিয়ে এসেছে। ফরজ গোসল। মেয়েটি কিছু খেতে চাইছে না, এটাই মুশকিল।

মিজানী বিবির কক্ষে যান। গলা খাকারি দেন। বলেন, পতির পদতলে স্ত্রীর বেহেশত। পতি যদি বলে, সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বিছানার ধারে, তবে তাই করবে একজন অনুগত নারী। আমি তোমার উপর খুবই খুশি। আল্লাহর কসম, বিবি, আমি তোমাকে ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবো না।

নাফিজার সমস্ত শরীরে অসম্ভব ব্যথা। এই ওয়াজ–নসিহত তার ভালো লাগে না। মনে হয়, সাতশ সাপের বিষথলি কেউ ঢেলে দিয়েছে তার তলপেটে।

বিবি নাফিজা কেঁদে ওঠে। মিজানীর মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসেন। তার মাথায় রাখেন হাত।

আম্মাজান, আম্মাজান। কাঁদে নাফিজা।

বিপদে আল্লাহ্‌র নাম নিতে হয় বিবি। যদি জিকির করতেই হয়, আল্লাহ্‌কে ডাকো। তিনি তোমার পাশেই আছেন। তিনি সর্বত্র আছেন।

আম্মাজান, আম্মা....। কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে নাফিজা।

আজ আর কোনো বিচার–আচার নয়, নয় কোনো শরিয়া কিংবা জামাতিয়া আদালত। আজকের দিনটি তিনি কাটাবেন তাঁর নয়া বিবির সঙ্গে মহব্বত করে। তাঁকে পেয়ার করে। সিদ্ধান্ত নেন মিজানী।

তিনি ডাকেন খাদেম মোল্লাকে। সিদ্ধান্তটা এখনই জানিয়ে দেয়া দরকার।

চমৎকার একটা ঘরে নেয়া হয়েছে শফি আকবরকে। তবে ঘরটাতে কোনো আসবাব নেই। প্রচণ্ড আলো এই ঘরে। এতো আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চোখ ধাঁধানো আলোও তো অন্ধকারই আসলে।

ঘরের ভেতরটা পারটেক্স দিয়ে মোড়ানো। মেঝেতে এককোণে একটা গালিচা। চারদিকে টবে রজনীগন্ধা ফুটে আছে। আশ্চর্য। এখনো এই দেশে রজনীগন্ধা ফোটে?

একজন সুদর্শন বৃদ্ধ বসে আছেন কার্পেটে। ধবধবে শাদা চুল, শাদা দাড়ি। সুফী সুফী চেহারা।

বসুন, জুতা খুলে পা তুলে বসুন। বৃদ্ধ আমন্ত্রণ জানান। মুখে হাসি।

আপনি কি চারদিকে এই সব রজনীগন্ধা দেখে অবাক হয়েছেন? সুগন্ধ পেয়ে অবাক হয়েছেন? অবাক হবার কিছু নেই। সবি কৃত্রিম। বানানো। গন্ধটাও কৃত্রিম। সুগন্ধ আল্লাহ্‌র রসুল (দ:) খুবই পছন্দ করতেন। আপনার কি খিদে পেয়েছে? কি খাবেন বলুন।

বৃদ্ধ নিজে ওঠেন। পাশের ঘর থেকে থালাভরা খাবার নিয়ে আসেন। সবই ফল। আঙুর, আপেল, খেজুর, কমলা, বেদানা। নিন, খান।

শফি ইতস্তত করেন। বৃদ্ধ তাঁকে একটা ফল এগিয়ে দেন। এক মুসলিম আরেকজন মুসলিমের দাওয়াৎ কবুল করতে কখনো দ্বিধা করেন না। আল্লাহ্‌র রসুল (দ:) অবশ্য বেদ্বীনদের দাওয়াৎও কবুল করতেন। এর কারণ ছিল, তখন তিনি ছিলেন তৌহিদের বাণী প্রচারে মনোযোগী। তখন বেদ্বীনদের দুয়ারে দুয়ারে পৌছাটা তাঁর জন্য দরকার ছিল।

শফি ফলটা তুলে নেন।

চারদিকে রজনীগন্ধার সৌরভ। আর আলো। আর এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। আর তার হাতে একটা লাল আপেল। খুব ভালো একটা ছবি আঁকা যায়। শাদা ক্যানভাসে লাল আপেল। শফির ঘোর ঘোর লাগে।

আপনার নাম তো শফি আকবর, নাকি?

জ্বী।

মোহাম্মদ শফি আকবর কিনা?

জ্বী, সার্টিফিকেটে মোহাম্মদ আছে।

মোহাম্মদ না বলাই ভালো। সেক্ষেত্রে দরুদ পাঠ করাটা কর্তব্য। যেমন মোহাম্মদপুর বললেও আপনাকে পড়তে হবে দরুদ। সাল্লাল্লাহে আলায়হিসসালাম। এমনিতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে অন্তরের শ্রদ্ধার ব্যাপার। আপনি কি বলেন?

জ্বী, আমিও তাই বলি।

আপনি কি আজ ফজরের নামাজ পড়েছেন?

জ্বী না, পড়িনি।

আস্তে আস্তে হবে। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।

আচ্ছা, আপনি যেন কি করেন?

জ্বী, আমি একজন শিল্পী। ছবি বিক্রি করে খাই। ক্যালিগ্রাফি করি। কলেমা লিখি। আল্লাহ্‌

রসুলের নাম লিখি। সেগুলো ফ্রেমে বাঁধাই করি। বড় বড় পার্টি সেগুলো কিনে নেয়। আমীর মহলেও আমার একটা ক্যালিগ্রাফির কাজ রাখা আছে।

উত্তম। আপনি ভালো কাজই করেন। সোয়াবের কাজ। আপনার কাজ কি দেশের বাইরে আছে? কোনো মিউজিয়ামে!

জ্বী না, আমি ঠিক বলতে পারবো না। থাকতে পারে। অনেকেই তো ছবি কেনে। কারা কেনে আমি তা মনে করে রাখি না।

আচ্ছা, হিন্দুস্তানের ছবি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা। ওরা কেমন আঁকে?

অনেক দিন যোগাযোগ নেই। ওরা কি করছে, কেমন কাজ করছে, আমরা জানি না। আমাদের জানার সুযোগ নেই।

এই ক'বছরে ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলে আপনি মনে করেন?

আমি কিছুই মনে করি না। তবে শিল্প-সাহিত্য হচ্ছে স্বাধীন মনের কাজ। বন্দী আত্মার পক্ষে ভালো কাজ করা সম্ভব নয়।

আপনি কি মনে করেন না এসব অপ্রয়োজনীয়? অবসর সময়ে মানুষ করবে ইবাদত। আল্লাহতা'লা মানব ও জ্বীন জাতিকে তাঁর এবাদতের জন্য তৈরি করেছেন।

আমি জানি না। তবে আমি এখন কাজ করি রুটি রুজির জন্যে।

তা ঠিক। হালাল পেশা অবলম্বন করা ইসলামে জায়েজ।

আচ্ছা, আপনি যে গান গাইলেন সমুদ্রের ধারে, সেটা কার লেখা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

গান গাওয়া যে অপরাধ, আপনি জানেন?

জ্বী, জানি।

আপনি যে অপরাধ করেছেন, তা মানেন?

জ্বী।

আচ্ছা, হিন্দুস্তানের সঙ্গে আপনার যোগাযোগের ধরনটা কি?

কোনো যোগাযোগ নেই।

আপনার বাসায় কি ক্যাসেট প্লেয়ার আছে।

জ্বী না। নেই। ইনকিলাবের সময় খোয়া গেছে।

তাহলে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনি মনে রাখলেন কি করে? তাঁর বই কি আপনার বাসায় আছে?

জ্বী না, নেই। এ দেশে আর একটা কপিও রবীন্দ্রনাথের বই নেই। সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের বই পুড়িয়ে ফেলায় আপনি রাগ করছেন। রাগ করাটা ঠিক নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি বলুন আজ এতো দিন পরে কিভাবে আপনি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন।

এটা যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল, আপনারা বুঝলেন কি করে? তার মানে আপনাদেরও মনে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, তার কথা, তার সুর। আমারও একইভাবে মনে আছে। সঙ্গীতের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। তা অন্তরে গেঁথে যায়। চলে যায় অবচেতনে। হঠাৎ করে তা একদিন বেরিয়ে আসে। এর কারণ তার সঙ্গীতধর্ম। এই কারণে আপনারা যেমন ভোলেন নি, আমিও তেমনি ভুলিনি।

না, আমাদের মনে নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমরা মনে করে বসে নেই। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে প্রতিবার।

যেই যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে, ঘন অন্ধকারে, তার চার পাশে জ্বলে উঠেছে জোনাকী। জোনাকীর আলো দিয়েই আমরা সনাক্ত করি এই অপরাধীদের। কিন্তু কেন এমন হয় আমরা জানি

না। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় অনেক গোমরই আমরা ফাঁক করতে পারিনি। সবই তাঁর কুদরাত। তবে আলেমদের ধারণা, এসব জ্বীনদের কাজ। বিধর্মী জ্বীন। যখন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, তখনই জ্বীনেরা হয়তো জোনাকীর রূপ ধরে আসে। আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় ব্যাপারটি কাকতালীয়। প্রকৃতিতে অতিলৌকিক কিছু ঘটতে পারে না।

খামোশ। বেঈমানী কথা বলবেন না।

এই বৃদ্ধ রেগে যান। সাংঘাতিক রাগ। তিনি কলিংবেলে চাপ দেন। দু'জন লোক আসে। তারা শফি আকবরকে বেঁধে ফেলে।

সুই নিয়ে এসো। ওর দশ আঙুলে ফোটাও।

শুরু হয় নির্যাতন। তারা জানতে চায়, হিন্দুস্তানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি?

শফি আকবর চিৎকার করতে থাকেন। তাঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। এবার ডান হাত। তিনি এতো যন্ত্রণা এর আগে কখনো পাননি।

বৃদ্ধ তখন হাসে। খুবই নিষ্কলুষ ধরনের হাসি।



দুহাতের দশটি আঙুলই ভাঙা, সেগুলো ফুলে উঠেছে। আঙুল ফুলে কলাগাছ– বড়ো ব্যথা আর কষ্টের মাঝেও হাসি আসে শফি আকবরের। তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে সেই বহুবিশ্রুত জামাতিয়া আদালতে। আজ দুটো মামলা চলবার কথা; একটি ইয়াকুবের ফুটবল খেলার অপরাধের বিচার, আরেকটি তাঁর নিজের। ইয়াকুবকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে, এই জামাতিয়া আদালত কক্ষে। তাদের দুজনেরই কোমরে দড়ি বাঁধা।

হাকিম আতিউর রহমান মিজানী এখনো আসেননি। তাঁর নতুন বিবির শরীর খারাপ, জ্বর। এছাড়া সেতারা বেগম নামে এক বাঁদীকে আল্লাহ্‌তায়ালা উঠিয়ে নিয়েছেন দুনিয়া থেকে, সর্পদংশনের অছিলায়। আজ তার কুলখানি হচ্ছে, তা নিয়েও ব্যস্ততা আছে মিজানী ছাহেবের।

কক্ষটি আসবাবশূন্য, একটি গালিচা পাতা, এক কোণে কোল বালিশ, মাথার উপরে ঝাড়বাতি; দেখলে মনে হয়, মুঘল আমলের দরবার। ইয়াকুব আর শফি আকবরের পাহারায় নিয়োজিত দুজন বদরিয়া শিবিরকর্মী। এছাড়া এক উর্দি–পরিহিত খানসামা কাগজপত্র, দলিল–দস্তাবেজ গোছগাছ করছে।

এই আদালতকক্ষের পাশের কক্ষটি জেনানাদের জন্যে। একটি ছোট্ট জানালা মতো আছে দুটি কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালে। সেই ছোট্ট গবাক্ষ–কাম–জানালায় চার চোখ পেতে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মহিলা– নাসিমা আকবর আর নাফিজার আম্মা। তাঁরা আগেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন যে, জামাতিয়া আদালতের বিচারকার্য দেখতে যাবেন মিজানী মহলে। সকাল সকাল চলে এসেছেন তাই নাসিমা, নাফিজার বাবা আবদুল হাফিজের বাসগৃহে। নাফিজার আম্মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসেছেন মিজানী মহলে। ফটকে কেউ বাধা দেয়নি, কারণ আবদুল হাফিজ নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে, তাঁর হাতে ছিল মিজানী ছাহেবের নিজ হাতে স্বাক্ষর করা অনুমতিপত্র। মিজানীর নয়া শাশুড়ি খায়েস করেছেন আদালত–কার্য দেখবার, সেই খায়েস কি অপূর্ণ থাকতে পারে?

নাসিমা গবাক্ষপথে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শফি আকবরের দিকে। আহা কি চেহারা হয়েছে বেচারীর! চুল উসকো–খুসকো, দাড়ি হয়েছে অনেক লম্বা আর এলোমেলো, চোখ দুটো এমনভাবে বসে গেছে যে দেখাই যাচ্ছে না। সে মেঝেতে এমনভাবে বসে আছে, বোঝাই যাচ্ছে, খুবই কষ্টে হচ্ছে তার।

নাসিমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। কান্নার অব্যয় ধ্বনিগুলো বহু কষ্টে চেপে রাখেন তিনি।

নাফিজার আম্মার অবশ্য খেয়াল নেই সেদিকে। তিনি তখন ভাবছেন তাঁর নাফিজাকে নিয়ে। বিচার শেষ হলে তাঁকে ঢুকতে দেয়া হবে অন্দরমহলে, দেখা করতে পারবেন তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে। কেমন আছে সে?

শফি আকবর তাকান ইয়াকুবের দিকে। এই কিশোরটিকে ধরে আনা হয়েছে এ › রকম

অকারণেই; দেশে যে জামাতিয়া শাসন চলছে তা মাঝে মধ্যে নাগরিকদের মনে করিয়ে দেবার জন্যেই এই অহেতুক হয়রানি। মনে করিয়ে দেয়া! তার কি কোনো দরকার আছে? প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি পদক্ষেপেই নাগরিকেরা বুঝছে হাড়ে হাড়ে, কাকে বলে ইনকিলাব আর কাকে বলে জামাতিয়া শাসন।

এই তো সেদিন টেলিভিশনে একজন আলেম প্রস্তাব করছিলেন দেশে সকল ধরনের সাহিত্য-কর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। তিনি উদ্ধৃত করছিলেন সেই বাণীকে, যাতে বলা হয়েছে, যখন কোনো ব্যক্তি তাহার উদর মিথ্যা-কবিতা দ্বারা পূর্ণ করিল, সে যেন তাহার উদর পুঁজ দ্বারা পূর্ণ করিল। কেতাবের কথা। সুতরাং কবিতা কিংবা অন্য কোনো কাল্পনিক সাহিত্য রচনা করা, পাঠ করা, শ্রবণ করা জামাতিয়া রাষ্ট্রে চলতে পারে না। অবশ্য এই প্রস্তাব এখনো গৃহীত হয়নি। কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কবিতা, সাহিত্য ও এলমচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে নানা মত নানা পথ। ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি জামাতিয়া শাসকগোষ্ঠি খুবই নিষ্ঠুর। সরাসরি তরবারির এককোপে কল্লা নামিয়ে ফেলাই রেওয়াজ এখানে, এখন।

ইয়াকুবের দুচোখ বেয়ে জল নামে। অস্ফুট শব্দ বেরোয় তার কণ্ঠ থেকে। আহা, কাঁদবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটি।

কোঁদো না ইয়াকুব, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, তোমাকে এখনি ছেড়ে দেবে নিশ্চয়ই। তুমি তো কোনো অপরাধ করোনি।

সান্ত্বনা ইয়াকুবের মনকে আরো নরম করে তোলে। সে সশব্দে, ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার বারবার মনে পড়ে তার ছোট ভাই ইউসুফের মুখ।

খানসামাটি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, পাহারাদার কর্মী দুটি দাঁড়িয়ে পড়ে সটান।

আসসালামু আলায়কুম।

দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে আতিউর রহমান মিজানী এসে প্রবেশ করেন এজলাশে।

তাঁর সঙ্গে আসে আরো কয়েকজন।

মিজানী দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুপাশে বালিশ গুঁজে অতিকষ্টে আধশোয়া হন।

তার দুপাশে দুই সারিতে বসে পড়ে বাকি লোকগুলো।

বিচারকার্য শুরু হয়। প্রথমে ইয়াকুব। তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা পেশ করে একজন। তারপর শুরু হয় আনুষ্ঠানিক জেরা।

বিসমিল্লাহির রাহমানুর রহিম। বলো, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স:)-এর কসম, যাহা বলিব, সত্য বলিব।

তুমি কি ফুটবল খেলেছো?

জ্বী না, আমি জাম্বুরা দিয়ে খেলছিলাম।

ওটা যে খেলা, তা তুমি জানতে?

জ্বী, এম্নি এম্নি খেলছিলাম। কিছু জেনে বা বুঝে খেলিনি।

খেলাকে আল্লাহর রসুল হারাম ঘোষণা করেছেন।

মিজানী মুখ খোলেন। বলেন, এই বালককে খেলতে দেখেছে কে কে? তিনজন মুসলমান সাক্ষী আছে?

জ্বী, আছে।

বদরিয়া বাহিনীর তিনজন লোক উঠে দাঁড়ায়।

প্রশ্নকর্তার মাথায় হঠাৎ একটা নতুন প্রশ্ন আসে। আচ্ছা, ছেলেটি জাম্বুরা পেলো কোথায়? চুরি করেনি তো?

ইয়াকুব, তোমাদের কি ফলের বাগান আছে?

জ্বী না, নেই।

জাম্বুরা তুমি পেলে কোথায়?

ইয়াকুব উত্তর দেয় না।

বলো, তুমি জাম্বুরা পেলে কোথায়?

শফি আকবর আর্ত বোধ করেন। মনে মনে বলেন, বাবা ইয়াকুব, বলো, বাজার থেকে কিনে এনেছি।

ইয়াকুবের কাছে সেই বার্তা পৌঁছায় না। সে বলে, পাশের বাগান থেকে এনেছি।

সেই বাগানটি কি বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল।?

জ্বী, ছিল।

গাছে কে উঠেছিলো, তুমি?

জ্বী।

প্রশ্নকর্তা এবার মিজানীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, হুজুর, এই যুবক এক বিশাল অপরাধ করেছে। সে চুরি করেছে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এক অসহ্য নীরবতা নেমে আসে এই এজলাশে।

আতিউর রহমান মিজানীর মাথায় রক্ত ওঠে, তার কপালের শিরা দপদপ করে কেঁপে ওঠে। একটি কঠিন সিদ্ধান্ত তাকে এখন নিতে হবে, খুবই কঠিন। মিজানী আবৃত্তি করতে থাকেন পবিত্র কোরান থেকে, পারা ৬, সুরা মায়িদা, ৩৮ নম্বর আয়াত।

'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন করো, ইহা উহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

এজলাশে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন আবদুল হাফিজ। তিনি বলেন, ইয়া হুজুর, ইয়াকুব ছেলেটি নিতান্তই কম বয়েসী। তাকে কি মাফ করা যায় না?

মিজানী গম্ভীর হন। শরিয়তের আইন অমান্য করার দুঃসাহস তাঁর নেই। তাছাড়া দয়ামায়া থাকলে শাসক হওয়া যায় না। হযরত আলী (রা:)–এর সঙ্গে হযরত আয়েশার (রাঃ) যুদ্ধ হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ। উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে এই যুদ্ধ বিখ্যাত। বিবি আয়েশার উট এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। শুধু আয়েশার জীবন বাঁচানোর জন্যে হাজার হাজার মুসলিম হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিলেন। হযরত আলী (রা:) তো সেদিন ছাড় দেননি। তিনি তো দ্বিধা করেননি। দ্বীনের মঙ্গলের জন্যেই করেননি। তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন মিজানী। ইনকিলাবের আগে তাঁদের দল জামাতিয়া মওদুদিয়া সহযোগিতা করে চলতো বেগম ওয়ালিদার নেতৃত্বাধীন এনএনপির সঙ্গে। কিন্তু যখন মনে হয়েছে এনএনপিই প্রধান বাধা ইনকিলাবের পথে, তখন তারা বসিয়েছেন তাদের জামাতিয়া আদালত। এরকম প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। গোপন সেই আদালতের প্রধান ছিলেন মিজানী ছাহেবই। সিদ্ধান্ত হয়, ওয়ালিদাকে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। তাহলেই কমজোর হয়ে পড়বে এনএনপি। নেতৃত্বে কোন্দল দেখা দেবে, বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে ওই পার্টিটি। ইত্যবসরে হিন্দুস্তানের মৌলবাদীরা তৎপরতা বাড়াবে এই দেশের বিরুদ্ধে। অখণ্ড হিন্দুস্তানে রামরাজ্য গড়বো, দেশমাতার বিভক্তি আদর্শ হিন্দু মেনে নিতে পারে না, এই আওয়াজ তুলবে তারা হিন্দুস্তানে। ফলটি দাঁড়াবে, দলে দলে লোকে যোগ দেবে জামাতিয়া মওদুদিয়ায়। অচিরেই সফল হবে জামাতিয়া ইনকিলাব। সেদিনও সিদ্ধান্ত নিতে এতোটুকু বুক কাঁপেনি মিজানীর।

শোনেন তাহলে, বলেন মিজানী, একদিন এক চোরকে আনা হলো হযরত মুহম্মদ (দ:)–এর

কাছে। হযরত (দ:) তার হাত কেটে দিলেন। সবাই বললো, ইয়া রসুলুল্লাহ (দ:), আমারা ধারণা করি নাই যে, আপনি তাকে এই শাস্তি দেবেন। রসুলুল্লাহ (দ:) বললেন, আমার কন্যা ফাতেমাও যদি এইরূপ অপরাধ করত, তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম। সহি হাদীস। বোখারী শরিফের।

এজলাশ আবার নীরব হয়ে পড়ে।

ইয়াকুব একমনে আঙুল ফোটায়। তার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। দাদা খেলতেন আরো ভালো। জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ছিলেন মোহামেডানে।

মোহামেডান।

ইউসুফ এখন কি করছে? নিশ্চয়ই এখন তার নীল জামাটা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই নীল জামাটার ওপর খুবই লোভ ইউসুফের। আব্বা তাদের দুজনকে একই সঙ্গে দুটো জামা বানিয়ে দিয়েছেন। তারটা নীল, ইউসুফেরটা সবুজ। সবুজটা পছন্দ হয়নি ইউসুফের। সে নীলটা পরার সুযোগ খুঁজছিল। এই মওকা নিশ্চয়ই সে ছাড়বে না।

আবদুল হাফিজ আবার উঠে দাঁড়ান। বলেন, ইয়া হুজুর, গাছের ফল চুরি সম্পর্কেও কি একই বিধান?

মিজানী গম্ভীর হন। একটা প্রশ্ন তুলেছে বটে। গাছের ফল নিয়ে হাদীসটি তিনি মনে করার চেষ্টা করেন। বয়স হয়ে গেছে, পুরোটা মনে পড়ে কি পড়ে না। বইটা একবার খুলে দেখা দরকার, সে উদ্যমও এখন অবশিষ্ট নেই তাঁর মধ্যে। আসলেই এবার তাঁর বিচারকার্য ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে। যদ্দূর পারেন, স্মৃতি থেকে হাতড়ে তিনি বলেন, হ্যাঁ, হাদীসে বলা হয়েছে, গাছে ঝুলন্ত ফল, তাহা বেড়া দিয়া সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহা চুরির অপরাধে হাতকাটা যাইবে।

হাদীসের বিধান আবদুল হাফিজ মেনে নেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আর তার রাসুল (দ:) অনেক বেশি জ্ঞানী, অনেক বেশি মঙ্গলময়, অনেক বেশি ন্যায় বিচারক।

মিজানী কোমর সোজা করে বসেন। ভাইসব, ইয়াকুব যে অপরাধ করেছে তা প্রমাণিত এবং তা সে নিজেই স্বীকার করেছে। চুরির অপরাধে শাস্তি খুবই কঠিন। একবার এক ব্যক্তি চুরি করলে নবী (দ:) নির্দেশ দিলেন তার ডান হাত কাটার। তাই করা হলো। এরপর সে আবার চুরি করলে তার বাম হাত কাটা হলো। একই অপরাধ পুনর্বার করায় তার ডান পা কাটা গেলো। এরপর বাম পা। এতো কিছুর পরও যখন সে পুনর্বার চুরি করলো, হযরত (দ:) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হলো।

কবজিতে ধারালো অস্ত্র প্রয়োগ করে এক কোপে ইয়াকুবের ডান পাঞ্জা কেটে নেবার রায় আমি ঘোষণা করলাম।

ইয়াকুব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তাকে দুজন কর্মী টেনে তোলে। পাশের কক্ষে নিয়ে যায়। জামাতিয়া আদালতের রায় কার্যকর করতে দেরি করা হয় না কখনো।

সাজা কার্যকর করা হবে প্রকাশ্যে। চুরি যাতে ভবিষ্যতে কেউ করার সাহস না পায় সে জন্যেই এই নিয়ম। পাশের কক্ষটিতে গ্যালারি মতো আছে।

আস্তে আস্তে লোকেরা এসে বসে পড়ে গ্যালারিতে। তারা একটি শাস্তি কার্যকর হওয়া দেখবে। তেমন কঠিন কোনো সাজা নয়। লোকদের মধ্যে তাই তেমন কোনো কৌতূহল কিংবা উত্তেজনা নেই। হাতকাটার শাস্তি তারা অনেক দেখেছে। তাদের সবচেয়ে ভালো লাগে বিবাহিত লোকের জেনার শাস্তি। সঙ্গেসার। অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে ঢিল নিক্ষেপ করা। ইয়াকুবের চোখ একটি কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়। বাম হাতটি ধরে একজন। পা দুটো জড়িয়ে ধরে আরেকজন। পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে তৃতীয় ব্যক্তি। ডান হাতটি রাখা হয় একটি কাঠের গুঁড়ির ওপর। কসাইদের মাংস কিমা করার জন্যে যে রকম বৃক্ষখণ্ড ব্যবহৃত হয়, অনেকটা সে রকম এই গুঁড়িটা। ইয়াকুবের

ডান হাতটি দুটো লোহার বেড়ি দিয়ে সেই গুঁড়ির সাথে আটকানো হয় অতি সহজে। যন্ত্রটি বহুল ব্যবহৃত। লোকগুলোও অতিদক্ষ।

একটি ধারালো তরবারি হাতে একজন বদরিয়া শিবির কর্মী এগিয়ে আসে।

বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবর।

ডান পাঞ্জাটি ছিন্ন হয়ে যায় মুহূর্তে। ছিটকে পড়ে একটু দূরে মেঝেয়। রক্ত পড়তে থাকে হুলহুল করে।

ইয়াকুব চিৎকার করে। এমন চিৎকার কেবল কুরবানির গোরুকেই করতে শোনা যায়।

আবদুল হাফিজ বাসায় ফিরে আসেন। তার মন উসখুস করে। কোথায় যেন গলদ হয়ে গেলো, কোথায় যেন?

তিনি হাদীস শরীফ বের করেন।

ফল চুরি করার শাস্তি অধ্যায়টি ভালো করে পাঠ করেন। 'ঝুলন্ত ফল, তাহা বেড়া দিয়া সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে এবং তাহার মূল্য একটি ঢালের সমান হইলে ইহা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাইবে।'

একটি জাম্বুরার মূল্য কি একটি ঢালের সমান হবে?

সম্ভবত না। মিজানী ছাহেব ভুল করেছেন, ছোট্ট একটা ভুল। কিন্তু তার ফলে একজন বালক তার হাত হারিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

কিন্তু আবদুল হাফিজ চুপ কর থাকেন। কাউকে কিছু বলেন না। নেতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও ধর্মে নিষেধ। তাছাড়া মিজানীর বিরোধিতা করার অর্থ মৃত্যু ডেকে আনা। হে আল্লাহ্, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। তোমার দ্বীনের, তোমার বাণীর, তোমার রসুলের বাণীর ভুল ব্যবহার বাড়াবাড়ি ব্যবহারের অপরাধ থেকে আমাদের পানাহ্ দাও। ইয়াগাফুরুর রাহিম। কাঁদতে থাকেন আবদুল হাফিজ।



আতিউর রহমান মিজানীর বৃদ্ধস্যতরুণীভার্যা নাফিজার খুব জ্বর। কপাল পুড়ে যাচ্ছে। খুবই শীত করছে তার। কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেও তাড়ানো যাচ্ছে না শীত।

মিজানী শুয়ে আছেন তার পাশে, একই বিছানায়। কি করবেন তিনি, বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি তার বুড়োটে শীর্ণ হাত রাখেন নাফিজার কপালে। হাতে যেন লাগে গরম তাওয়া। নাফিজা চোখ মেলে। চোখ লাল আর ফোলাফোলা। তার বালিকাশোভন মুখমণ্ডল থেকে জ্বরের উত্তাপ বেরুচ্ছে, যেন লাল অঙ্গার থেকে বেরুচ্ছে আগুনের আঁচ।

সমস্ত শরীরে বেদনা। খুব খারাপ লাগে নাফিজার। কষ্ট হয় তার, ভীষণ কষ্ট।

আম্মাজান, আম্মাজান।

ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করে নাফিজা।

মিজানী উঠে বসেন বিছানায়। তাকান নাফিজার দিকে। তার মায়াশূন্য হৃদয়েও এই নিষ্পাপ বালিকার মুখ মায়ার সঞ্চার করে।

বিবি, আল্লাহকে ডাকো।

নাফিজার কানে এই হিতোপদেশ পৌছায় কিনা কে জানে। সে আবার বলে, আম্মাজান, আম্মাজান।

বিবিজান, অধীর হয়োনা। আল্লাহকে স্মরণ করো। একদিন হযরত রাসুল্লাহ (দঃ) উম্মে সায়েব নাম্নী এক রমণীর গৃহে উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন– তুমি কাঁপছো কেন? তিনি বলেন, আমার জ্বর হয়েছে। আল্লাহ তার বিনাশ করুক।

হযরত বললেন, জ্বরকে খারাপ বলো না, কারণ হাঁপর যেমন লোহার মরিচাকে দূর করে, জ্বর তেমনি মানুষের পাপকে দূর করে।

বিবি, শুনছো। হাদীস শরীফের কথা শুনতে পাইছো।

তিনি শুনতে পান নাই। শুনবার মতো অবস্থা তেনার আপনি রাখেন নাই।

মিজানী ছাহেবের মুখের কথা কেড়ে নেয় তার খাসবাঁদী গুলমোহর। সে কখন এ ঘরে ঢুকে পড়েছে, মিজানী ছাহেব লক্ষ্য করেননি। আসলে চোখ–কান তাঁর তেমন কাজ করে না আজকাল।

নয়াবিবির খুব জ্বর। আগুনের মতো গা গরম, তাই তাকে একটু ধৈর্য ধরতে বলতেছি। আল্লাহতালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

গুলমোহর মিজানী ছাহেবের এসব কথা খুব একটা মন দিয়ে শোনে বলে মনে হয় না। সে নাফিজার কপালে হাত রাখে। জ্বরের প্রচণ্ডতা দেখে আঁৎকে ওঠে। বলে, এই মাইয়া তো এখুনি মারা যাবে। আপনি কি করতাছেন এইসব। ডাক্তার–কবিরাজ–হাকিম ডাকেন। বিবিরে দাওয়াখানায় নেন।

বাজে বকিস না গুলমোহর। হায়াৎ–মউত–রিজক–দৌলত আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র নাম নে।

মিজানী ধমক দেন তার বাঁদীকে। এই সব ছোটজাতের জেনানাদের প্রশ্রয় দেয়াই ঠিক নয়। এদেরকে সব সময় রাখতে হয় চিপার মধ্যে। আল্লাহতা'লার ভয় এদের দিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

তবে তিনি নাফিজার শরীর নিয়ে আসলেই উদ্বিগ্ন। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। হাকিম ডাকা দরকার।

দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার অবস্থা খুবই খারাপ। ইনকিলাবের সময় বহু মেডিকাল কলেজের বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে। প্রাণীর ছবি আঁকা–বই পোড়ানোর হুজুগে বহু চিকিৎসাশাস্ত্রের বই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বদরিয়া শিবিরবাহিনী মেডিকাল কলেজের ডিসেকশন রুম থেকে লাশগুলো বের করে এনে দাফন–কাফন করেছে। নির্দেশ জারি করা হয়েছে– মুর্দাদের প্রতি নির্মম আচরণ করা যাবে না। মানবদেহ নিয়ে কাটা–ছেঁড়া করা যাবে না। উদাহরণ দেয়া হয়েছে ইতিহাস থেকে। ৭৬৫ সালে খলিফা আল–মনসুর পীড়িত হলে ইরানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে জুরজী–ইবনে–বকতিয়াশুকে ডেকে আনা হয়। জুরজীর ছেলে বখতিয়াশু ছিলেন বাগদাদ মেডিকাল কলেজের পরিচালক। তার ছেলের নাম জিব্রিল। তিনিও বিখ্যাত চিকিৎসক। জিব্রিলের ছাত্র ছিলেন খৃষ্টান চিকিৎসক ইউহান্না–বিন–মাসাওয়াই। এই খৃষ্টান ছাত্র চিকিৎসা–বিজ্ঞানে অনেক বড় অবদান রেখে গেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিতে ইউহান্না ও তাঁর ছাত্র হুনাইন–বিন–ইসহাকের অবদান চিকিৎসাবিজ্ঞান আজো স্মরণ করে। এঁরা দুজন লিখে গেছেন চক্ষুশাস্ত্রের ওপর প্রথম বই। কিন্তু এতো বড় চিকিৎসকরাও মানুষের শব নিয়ে কাটা–ছেঁড়ার সুযোগ পাননি। শব ব্যবচ্ছেদ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইউহান্না সে কারণে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান বানরের ওপর।

হুজুর পাক, আমি বিবির মাথায় পানি ঢালতেছি। এতো গরমে বিবি ছাহেবার সব পাপ এতোক্ষণে পুড়ে তো গেছেই, মনে হয় সোয়াবও পুড়তে আরম্ভ করেছে। আপনি তেনার বাবা–মারে খবর দেন। আর ওষুধ–বিষুধ কিছু থাকলে দেন, খাওয়ায়ে দেই। গুলমোহর বলে মিজানীকে।

নাফিজা প্রলাপ বকতে শুরু করে। তিনজন দাড়িঅলা লোক তাকে মারতে আসছে, তাদের হাতে খোলা তরবারি। তারা এখনি তার গলায় কোপ বসাবে।

মিজানী ছাহেব বিচলিত বোধ করেন। ঘরে ওষুধ–পথ্য তেমন কিছু নেই। কেবল কালিজিরা আছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ অনুযায়ী 'কালিজিরায় মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় রোগের উপশমের গুণ আছে।'

কালিজিরা খাওয়াও। আল্লাহর রসুল (দঃ) কালিজিরার ফজিলত বর্ণনা করে গেছেন। আর খাদেম মোল্লারে ডাকো। বিবি নাফিজার পিতা আব্দুল হাফিজকে একবার আসতে বলি। তিনি দেখুন তার কন্যার হাল হকিকত। দেখে ভালো–মন্দ পরামর্শ দিন।

নাফিজার আব্বা আবদুল হাফিজ আর আম্মা আসেন। গুলমোহর তখন তার মাথায় পানি ঢালছে। নাফিজা প্রায় বেহুঁশ। সে আম্মা আব্বাকে চিনতে পারে না। চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ভয় পাওয়া স্বরে বলে, আম্মাজান, আম্মাজান, ওই ওরা আবার আসছে। আমাকে মারতে চায়। ও, আম্মা আমাকে ধরেন, ও আম্মা, দেখেন দেখেন, কতো বড় তলোয়ার।

নাফিজার আম্মা মেয়ের শিয়রে বসা। তাঁর চোখ বেয়ে দড়দড় করে পানি ঝরে। তাঁর গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি কোনো শব্দ করেন না। অনেক কষ্টে কণ্ঠ চেপে রাখেন।

মিজানী ছাহেবের মুখোমুখি হন আবদুল হাফিজ। হুজুর, আমার মেয়েকে আমি আপনার হাওলায় তুলে দিয়েছি। আপনিই এখন তার অভিভাবক। তার সম্পর্কে এখন আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। বলা উচিতও নয়। তবুও এই আমার একমাত্র মেয়ে। নাফিজা। নাফিজা আমার বিশেষ স্নেহভাজন। তার এই দুঃখ-কষ্ট হুজুর আমি সহ্য করতে পারতেছি না। মেয়েটা বড় কষ্ট পাচ্ছে। অতীব কষ্ট। তার চিকিৎসার কি কোনো ব্যবস্থা করা যায় না? আবদুল হাফিজ কেঁদে ফেলেন। তার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে।

মিজানী ছাহেব খানিকটা বিরক্ত হন। আবদুল হাফিজ লোকটি তাঁর সবিশেষ অনুগত। তিনি আশা করেছিলেন, সে বলবে, আপনি এর জন্যে দোয়া করেন; বলবে, আপনি তাকে মাফ করে দিন; বলবে, আপনি তার শরীরে দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে দিন। কিন্তু তা সে বললো না। উল্টো চিকিৎসার কথা বলেছে। দেশে কি চিকিৎসা আছে নাকি?

মুখে বললেন, ধৈর্য ধারণ করুন আবদুল হাফিজ। আল্লাহতালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। রোগ-শোক আল্লাহ দেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে। সেই পরীক্ষায় পাস সবাই করতে পারে না। আমি মনে করি, আপনি পারবেন। নবী করিম হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর সন্তানও কি অকালে মারা যায়নি? আল্লাহ্তালা কাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, আর কাকে তুলে নেবেন, সব তাঁরই ইচ্ছা। সবই পূর্বনির্ধারিত।

তবু চিকিৎসা করতে তো মানা নাই। আল্লাহর রসুল (দঃ) নিজ শরীরে বেদনা লাঘবের জন্যে শিঙ্গা নিতেন। তিনি তো বলে গেছেন, আল্লাহতালা যতোগুলো রোগ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর ওষুধও করে গেছেন।

শাস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করবেন না আবদুল হাফিজ। আল্লাতা'লা নিশ্চয়ই রোগের ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব রোগের চিকিৎসা কি মানুষের জানার মধ্যে আছে? যাই হোক, এখন আপনি কি করতে বলেন?

হাকিম ডাকেন। বাইরের হাকিমের দরকার নাই। মিজানী মহলের হাকিম সাহেবকেই ডাকেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাকে দেখান রোগীকে।

আপনি কি চান, মিজানী মহলের একজন পর্দাকরনেওয়ালি বিবি দেখা করুক বেগানা পুরুষের সঙ্গে? এতে কি তার গোনাহ হবে না? আমরা সবাই কি সেই গোনাহের ভাগীদার হবো না?

হুজুর, এই প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আপনি এই এলাকার প্রধান মুফতি। আপনার ফতোয়াই এখানে পালনীয়। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি আলেম। চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যাবে কি যাবে না, তা আপনার চেয়ে কে আর ভালো জানে, ভালো বলতে পারে। তবে হুজুর, রসুল পাক (দঃ) এর সময়েও তার বিবিরা উটে চড়ে যুদ্ধের ময়দানে গেছেন, অন্য আওরাতের সঙ্গে নবীর দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে।

এ সব কথাই সত্যি, এসব যে মিজানী জানেন না, তা নয়। তবে তাঁর ভয় অন্যখানে। নাফিজার জ্বর এসেছে শরীরের ক্ষত থেকে। ওই ক্ষত মিজানীর হাত দিয়ে তৈরি। ডাক্তার এলে সেই গোমর ফাঁক হয়ে যেতে পারে। তাহলে এই শকুন-বুড়ো বয়সে তাঁর বিয়ে করার উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাবে।

মিজানী বলেন, আবদুল হাফিজ সাহেব, আল্লাহর নবী (দঃ) বলে গেছেন, উত্তম ওষুধ দুটি, মধু আর কোরান শরীফ। এছাড়া কালিজিরার কথাও তিনি বিশেষভাবে বলেন গেছেন। আমি নাফিজাকে মধুসহযোগে কালিজিরা সেবন করাচ্ছি। আর তার জন্যে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এই চিকিৎসাই শাস্ত্রসম্মত। এর বাইরে কোনো চিকিৎসা করাটা ঠিক হবে না। একজন বেগানা পুরুষ যদি নাফিজার চুল দর্শন করে, পরকালে সেই চুল আগুনের সাপ

হয়ে তাকে দর্শন করবে। আমার শাদী করা বিবির এই অমর্যাদা আমি হতে দিতে চাই না।

গুলমোহরের শুশ্রূষায় নাফিজার বেশ উপকার হয়। মাথায় পানি দেয়ার ফলে তার জ্বর কমে আসে, সে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়।

তার আম্মাকে পাশে দেখে সে খুশি হয়ে ওঠে।

আম্মাজান, কখন এসেছেন?

বহুক্ষণ মা, বহুক্ষণ।

আম্মাজান, আপনারা কি আমাকে নিতে এসেছেন?

নাফিজার আম্মা কোনো জবাব দেন না। তার কণ্ঠদেশে কান্না এসে জমা হয় প্রচণ্ডবেগে।

আম্মা, আমাকে নিয়ে চলেন। আমি আমাদের বাড়িতে যাবো।

সে তার মাকে কাছে টানে। তিনি মাথা নামিয়ে নেন মেয়ের মুখের কাছে। নাফিজা বলেন, আম্মা, আমার এখানে খুবই কষ্ট। এতো কষ্ট যে আম্মা আপনাকে বলতে পারবো না। আমাকে মেরেই ফেলবে হয়তো। আম্মা, আমাকে ছেড়ে যাবেন না।

নাফিজার মা ডুকরে ওঠেন। বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় তাঁর কণ্ঠ থেকে।

মিজানী ছাহেবের কান পর্যন্ত পৌঁছায় সেই বিলাপ। তিনি বিরক্ত হন। বলেন, আবদুল হাফিজ, আপনার বিবিকে চুপ করতে বলেন। মুসলিম মহিলার কণ্ঠস্বর তার স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ শুনতে পাবে– এটা ঠিক নয়।

আবদুল হাফিজ মেয়ে–বিবির কাছে যান।

নাফিজা বলে, আব্বাজান, আমি আর এখানে থাকবো না। আপনাদের সঙ্গে বাসায় যাবো। আমাকে নিয়ে যাবেন।

আবদুল হাফিজও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটাই সঙ্গত মনে করেন। এখানে মিজানী ছাহেবেরই দেখাশোনা কে করবে, তার ঠিক নেই, আর তাঁর মেয়েকে কে দেখবে? তিনি সমর্থন পান গুলমোহরের কাছ থেকে। গুলমোহর বলে, চাচাজান, বিবি ছাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে যান। হাকিম–কবিরাজ দেখান। দাওয়াই বাৎলান। এখানে এভাবে পড়ে থাকলে সে নির্ঘাত মরে যাবে।

হুজুর পাক, বেয়াদবি নেবেন না, আবদুল হাফিজ হাজির হন মিজানী সমীপে। আমি কি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

মিজানী তাঁর বাক্যটি খেয়াল করেন। আমার মেয়ে? বিয়ে দেবার পরে মেয়ে আর নিজের মেয়ে থাকে না, স্বামীর হয়ে যায়, এ কথা কি আবদুল হাফিজকে শেখাতে হবে? কেন সে নিয়ে যেতে চায় মেয়েকে? এখানে কি তার যত্ন–আত্তি হচ্ছে না? স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য কি তিনি পালন করছেন না?

তিনি বলেন, কেতাবে স্ত্রীকে বলা হয়েছে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে। রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, আমি যদি কাউকে অন্যের প্রতি সিজদাবনত হবার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীলোককে তার স্বামীর প্রতি সিজদাবনতা হবার আদেশ করতাম।

আবদুল হাফিজ এই হাদীস জানেন। কিন্তু এখানে থাকলে, তাঁর ভয় হয়, তাঁর মেয়ে নাফিজা মারা যাবে।

ইয়া হুজুর, এখানে থাকলে যদি তাঁর চিকিৎসা না হয়, যদি সে মারা যায়?

অবিশ্বাসীদের মতো কথা বলবেন না। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো মৃত্যু হয় না। আর তা ছাড়া তার যদি মৃত্যু লেখাই থাকে তবে যেখানেই নিয়ে যান না কেন, মৃত্যু আসবেই। সেক্ষেত্রে এখানে থাকাই ভালো। আল্লাহর রসুল (দঃ) বলেছেন, 'যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, মৃত্যুর পরে সেই স্ত্রীলোক বেহেশতে প্রবেশ করবে'। আপনি চান না, জনাব আবদুল

হাফিজ, আপনার কন্যা বিবি নাফিজা জান্নাতবাসিনী হোন!

তার মেয়ে নাফিজা জান্নাতবাসিনী! আবদুল হাফিজ কাঁদতে থাকেন।

আতিউর রহমান মিজানীর মন তাতে গলে না। বরং আরো কঠিন হয়ে ওঠেন তিনি। এই মেয়েকে মহলের বাইরে যেতে দেবার অর্থ তাঁর অনেক দুর্বলতার কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়া। তা হতে দেয়া যায় না।

বিবি নাফিজা এখানেই থাকবেন। এই আমার শেষ কথা।

যেন রায় ঘোষণা হয় জামাতিয়া আদালতের। আবদুল হাফিজ চমকে ওঠেন। তাঁর মাথা থেকে টুপি পড়ে যায় মেঝেতে।

নাফিজার আব্বা আর আম্মা বিদায় চান মেয়ের থেকে। নাফিজা এখন খানিকটা বল পেয়েছে শরীরে। সে বিছানায় আধা-শোয়া। সে তার মায়ের এক হাত বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

আসি মা, আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো।

তার আম্মা হাতটি ছাড়াতে চান। নাফিজা কিছুতেই ছাড়ে না। আবদুল হাফিজ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন। বেরুনোর সময় তাঁর ইচ্ছা হয় মেয়ের দিকে একবার তাকান। কিন্তু সাহস পান না। মানুষের মন বড়ই দুর্বল। নফসে আম্মারাকে শাসন করতে জানতে হয় মোমিনদের। এখন যদি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি আর ফেরাতে না পারেন চোখ? যদি তার মনে হয়, মেয়েকে না নিয়ে তিনি ফিরবেন না?

তিনি বেরিয়ে আসেন। মা ও মেয়ের বিদায়ের দৃশ্য রচিত হচ্ছে পেছনে। সেই দৃশ্য খুবই বিয়োগান্তক। মেয়ে বলছে মাকে, এর পরেরবার এসে আমাকে নিয়ে যেও আম্মা।

তারপর কেবল ক্রন্দন। কান্না। কেন এতো করুণ?

কেন বিশ্বজুড়ে এই এক অভিব্যক্তি দুঃখের প্রচণ্ডতায় জল হয়ে আসে দুচোখে, বিলাপ হয়ে ঝরে কণ্ঠ বেয়ে?

নাফিজার আম্মাও বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। আম্মাজান, আম্মাজান। নাফিজার মিহি চিকন কান্না চড়ুইপাখির ঠোঁটের মতো কাঁপতে থাকে বাতাসে।

এই বিদায়ের পাঁচদিন পর মারাত্মক জ্বর ও প্রদাহ-বেদনায় ধুঁকে ধুঁকে নাফিজা মারা যায়।

শোনা যায়, শেষ দিকে একজন জ্বীন-হেকিম তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই হেকিম ছিল এফসিপিএস পাস। জ্বীনের পিজি হসপিটাল ও কলেজ থেকে এই হেকিম জ্বীন পাস করেছেন। জ্বীনের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় নাফিজার মৃত্যু আসলে তার হায়াৎ ফুরিয়ে যাবারই নিদর্শন।

ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন।

সকলেই আল্লাহর ইচ্ছায় মিজানীর নয়াবিবি নাফিজার মৃত্যুকে মেনে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। তার পিতা আবদুল হাফিজ জায়নামাজে বসে দুহাত তোলেন, হে আল্লাহ তুমি মানুষকে হেদায়েৎ করো, সত্য পথে পরিচালিত করো।



রাতে ভাত রাঁধতে গিয়ে নাসিমা দেখেন – চাল নেই। দুপুরেই শেষ হয়ে এসেছিল। যেকটা ছিল তাই রেঁধেছিলেন। দুটো আলু সিদ্ধ করে ভর্তা করে খেয়েছিলেন। এ–রকমই চলছে আজকাল। খাওয়া–দাওয়ার দিকে খেয়াল থাকে না। ঘুম নেই, গোসল নেই। শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর। শফি আকবরের চিন্তাটা মাথা থেকে নামাতে পারেন না তিনি। শফিকে ধরে নিয়ে গেছে আজ কতোদিন হলো? আঙুলে গুনতে শুরু করেন নাসিমা। গোনা শেষ হয় না। খোদাই মশা গায়ে বসে। পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে খিদেয়। এতোক্ষণ খিদেটা চাপা পড়ে ছিল, এখন চাল নেই বুঝতে পেরে জানান দিচ্ছে।

হাতে পয়সা নেই আর। এভাবে দিন আর চলে না। একটা কিছু করা দরকার। শফি আকবরের ক্যালিগ্রাফি বিক্রয় কেন্দ্রটা চালু করা দরকার। ছবি যেগুলো আঁকা আছে, সে–সব বিক্রি করলেও কয়েকটা দিন চলে যাবে। তাছাড়া তিনি নিজেও শুরু করতে পারেন আঁকাআঁকি। আর্ট কলেজে পড়াটা শেষ করতে পারেননি বটে, তবে ছবি আঁকা একদম ভুলে গেছেন–অমনতো নয়।

শূন্য হাড়িটা রান্নাঘরে রেখে শোবার ঘরে চলে আসেন নাসিমা আকবর। ঘরে কোনো খাবার নেই, একটা খেজুর কিংবা শুকনো রুটি পর্যন্ত নয়। একগ্লাস পানি খেয়ে নেন তিনি। পেটের জ্বালাটা কিছু কমে তাতে।

কিন্তু শফি আকবরের অফিসটা চালাবে কে? জেনানা–আওরতদের ঘর থেকে বেরুনো হারাম। কঠোরভাবে নিষেধ। কোরান শরীফ হাদীস শরীফে কি আছে, আল্লাহ্ জানেন। এদেশটা কি আসলেই ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলছে, নাকি চলছে মওদুদী বিধান অনুসারে? এই প্রশ্ন উদিত হয়, নাসিমা আকবরের মনে। সঙ্গে সঙ্গে রোম খাড়া হয়ে যায় তাঁর। এ দেশে নবী–রাসূলের ক্রিয়া–কর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে কিন্তু মওদুদীবাদ নিয়ে নয়। সরকারি প্রচারযন্ত্রের কারণে মওদুদীর বই এখন ঘরে ঘরে। সবার জন্য অবশ্য পাঠ্য। যে কোনো সময় বদরিয়া বাহিনী যে কোনো কাউকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে, বলো হযরত আবু আলা মওদুদী ছাহেবের দস্তুরী তাজাবিজ গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় কি আছে? না, পারলে কান ধরে ওঠ–বোস।

অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে নেমেছে যে আজ। মওদুদী ছাহেবের বিধান অনুযায়ী এদেশে কোনো নারী কোনো ধরনের বৃত্তিমূলক কাজ করতে পারে না। চাকরি করতে পারে না, ব্যবসা–বাণিজ্য করতে পারে না, এমনকি হতে পারে না হাসপাতালের নার্স।

হযরত মুহম্মদ (দ:)–এর জামানায় নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে কি, মওদুদী যা বলবেন তাই এখন চূড়ান্ত।

মওদুদী বলেছেন, ইসলামিক রাষ্ট্র দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই ইসলামের নীতিমালা থেকে সরে গিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না এবং সে এরূপ ইচ্ছাও করতে পারে না। রাজনীতি, দেশের

প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সামরিক খিদমত এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ পুরুষের। চোখ বন্ধ করে অন্যদের অজ্ঞতার অনুসরণ করা জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। ইসলাম নীতিগতভাবে যৌথ সমাজব্যবস্থার বিরোধী। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এর অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের জনসাধারণও যদি তা ভোগ করার জন্য তৈরি হয়ে থাকে, তবে যতো ইচ্ছে করতে পারে। তাছাড়া কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, জোর করে ইসলামের নামে এমন সব কাজের বৈধতা বের করতে হবে, যেগুলো সে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ইসলামে যুদ্ধক্ষেত্রে যদিও মহিলাদের দ্বারা আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি ইত্যাদি বাঁধার কাজ করানো হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শান্তি অবস্থায়ও তাদের সরকারি দফতর, কারখানা, ক্লাব ও পার্লামেন্টে এনে দাঁড়া করিয়ে দিতে হবে। মওলানা মওদুদী ছাহেবের লেখা 'বিসবী সদি মে ইসলাম' বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠায় আছে এই ফতোয়া। এসব ফতোয়া এখন কথায় কথায় উচ্চারিত হয়। আওরাত-জেনানারা যাতে ঘরের বাইরে না যায়, সেজন্য তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়।

মওলানা মওদুদী ছাহেব রচিত তাফহিমুল কোরআন গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও এ কথার কী অবকাশ আছে যে, মুসলিম মহিলারা কাউন্সিল ও পার্লামেন্টের সদস্য হবে? ঘরের বাইরে সামাজিক তৎপরতায় দৌড়াদৌড়ি করবে, সরকারি দফতরে পুরুষদের সাথে কাজ করবে, কলেজগুলোতে ছেলেদের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করবে, পুরুষদের হাসপাতালে নার্সিংয়ের দায়িত্ব পালন করবে, বিমান ও রেলকারে যাত্রীদের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হবে এবং শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকা-ইংল্যান্ড যাবে?' নাসিমা আকবর বিষণ্ণভাবে হাসেন। এসব কথা আজ উচ্চারিত হয় জোরে-শোরে। অথচ তাঁর শৈশবে এই জামাতিয়া-মওদুদিয়ারা ঠিকই পার্লামেন্টের সদস্যা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন এনএনপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মহিলা এমপি হিসেবে সংসদে যেতো তারা। বোরখাপরা সেসব এমপিকে বলা হতো প্যাকেট। এসব প্যাকেট মাঝেমধ্যে মুখও খুলতো পার্লামেন্টে। তাদের কণ্ঠস্বর পুরুষদের কানে গেলে কি পাপ হতো না তখন? এসব নিয়ে নাসিমা প্রশ্ন করেছিলেন নাফিজার আব্বা আব্দুল হাফিজকে। আব্দুল হাফিজ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপা, এরকম অনেক প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছে। আমি এসব সওয়ালের জবাব খুঁজছি। আমাদের দ্বীনি ওস্তাদ রাজনৈতিক শিক্ষক মওলানা আবু আলা মওদুদী ছাহেব ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৪/৬৫ সাল পর্যন্ত নারী-শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আওরাত-জেনানাদের রাজনীতিতে টেনে আনা, পার্লামেন্টের সদস্য হতে দেয়াকে ইসলামবিরোধী বলেছিলেন তিনি। দস্তুরী তাজাবিজ গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় মওদুদী (আঃ) বলেছেন, 'আইন পরিষদগুলোতে মহিলাদের সদস্য হওয়ার অধিকার দেয়া হলো পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অন্ধ অনুকরণ। ইসলামের নীতিমালা এর অনুমতি দেয় না। ইসলামে রাজনীতি ও দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষের ওপরই ন্যস্ত।' ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কন্যা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন কিনা এ নিয়ে মওদুদী ছাহেব ফতোয়া দেন। তখন তিনি বলেছিলেন, মহিলা সমাজের কর্মক্ষেত্রই আলাদা। সুতরাং মিস ফাতেমা জিন্নার রাষ্ট্রপ্রধান পদগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। এটা হলো পুরুষের কাজ।' এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তানে ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ান। তার জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঠিক তখনই মওদুদী ছাহেব সুর পাল্টে ফেলেন। তিনি ফতোয়া দেন, 'মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারে কোনোই বাধ্যবাধকতা নেই। মহিলার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা কিংবা হজ্ব করা অবৈধ বলাও অন্যায়।'

আপা, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই গুমর ফাঁক করতে পারছি না। ওই সময় মওদুদী ছাহেব এও বলেছিলেন, 'আমাদের ওপর ফরজ হলো মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে

বর্তমান সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক পথে ক্ষমতাচ্যুত করা। আল্লাহতালা এর চাইতে সুবর্ণ সুযোগ আর দান করতে পারেন না।' একেবারে ফরজ বলা হলো এই কাজকে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও। বলে কেঁদে ফেলেছিলেন আব্দুল হাফিজ। মনটা বড়ই নরম তাঁর।

বাইরে শেয়াল ডাকে। পেটটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। নাসিমা আকবর বিছানা ছাড়েন। এক গ্লাস পানি ঢেলে খান।

দু'টি বিড়াল কাঁদে। পেঁচা ডাকে। মনে হয় বাইরে মেলা বসেছে জ্বীনপরীদের। এই এক উৎপাত হয়েছে- জ্বীনের উৎপাত। প্রায় সবার মনের অন্ধকারেই বাসা বেঁধেছে জ্বীন-ভূতেরা। হাদীস কোরানের কথা। কে অস্বীকার করবে জ্বীনের উপস্থিতি? একজন দু'জন ক্ষীণস্বরে বলেছিল, আল্লাহতা'লা মানুষ ও জ্বীনকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, জ্বীনজাতিকে রাখা হয়েছে অন্য কোনো গ্রহে। কিন্তু সে প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি। উদ্ধৃত করা হয়েছে হাদীস শরীফ থেকে। আবু দাউদ ও মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, 'জ্বীনদের এক প্রতিনিধি দল একবার রাসুলুল্লাহ (দ:) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করলো... ইয়া রাসুলুল্লাহ (দ:)! আপনার উম্মতের কিছু লোক হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করে। অথচ আল্লাহ এইগুলোকে আমাদের জীবনোপকরণ করেছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (দ:) প্রস্রাব-পায়খানায় এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিলেন।'

তার মানে জ্বীনেরা এই দুনিয়াতেই বসবাস করছে। হাড়, গোবর, কয়লা তাদের জীবনের নানা কাজে লাগে। তাদেরও সভা-সমিতি আছে। প্রতিনিধিদল আছে। যে-ব্যক্তি এসব অস্বীকার করবে, সে মুসলিম থাকবে কি প্রকারে?

নাসিমা আকবরের মনে পড়ে শফি আকবরের কথা। ভূত-প্রেতে সে একেবারেই বিশ্বাস করে না। তার মতে, শিশুদের গল্প-কবিতা থেকেও ভূত-প্রেতের প্রসঙ্গ মুছে ফেলা উচিত। আহা, বেচারা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে? নাসিমা নিজে তো ঠিকই শুয়ে আছেন বিছানায়, না জানি কোথায় রাত কাটাচ্ছেন শফি আকবর?

এদিকে হাতে টাকা-পয়সা নেই, ঘরে নেই চাল। একটা কিছু করা দরকার। সকালে উঠে আব্দুল হাফিজের কাছে যেতে হবে, সিদ্ধান্ত নেন নাসিমা। তিনি তাঁর কাছে একজন লোক চাইবেন। যে তাদের 'আকবরিয়া হরফখানা' চিত্রশালাটির দেখভাল করতে পারবে। কিছু একটা শুরু না করলে তো না খেয়েই মরতে হবে। এছাড়া যেতে হবে মিজানী ছাহেবের কাছে। আবেদন জানাতে হবে স্বামীর মুক্তির ব্যাপারে। তদ্বিরে পাথরও গলে, মিজানী ছাহেবের মন কি গলবে না?

এদিকে তাদের নামে এক ফরমান জারি হয়েছে। ট্যাক্স দিতে হবে। তারওপর ধার্য করা হয়েছে তিন ধরনের কর। উশুর বা বাণিজ্যিক কর, খারাজ বা অমুসলমানদের ভূমি কর, জিজিয়া বা নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। জিজিয়া ধার্য হবার কথা শুধু অমুসলিমদের ওপরে। ইনকিলাবের গোড়ার দিকে তাই করা হতো। কিন্তু এখন অমুসলিম বলতে দেশে কেউ আছে বলে মনে হয় না। হয় মারা গেছে, নয়তো জান নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। জিজিয়াখাতে আয় তাই গেছে কমে। সেই আয় বাড়ানোর জন্য এখন আঁটা হয়েছে নতুন ফন্দি। যে-সব মুসলিম জামাতিয়া-মওদুদিয়ার সদস্য নয় তাদেরও দিতে হবে জিজিয়া বা নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। টেলিভিশনে এই আইনটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। মওলানা আবু আলা মওদুদী ছাহেবের সংজ্ঞানুযায়ী সবাই মুসলমান নয়। মওদুদী ছাহেব বলে গেছেন কে আসল মুসলিম আর কে নয়। সিয়াসী কাশমকাশ গ্রন্থে মওদুদী ছাহেব বলেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় যারা 'গায়ের ইলাহী' সরকার মিটিয়ে দিয়ে ইলাহী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের গড়া আইন-কানুনের বদলে খোদাই আইন-কানুন দ্বারা দেশ শাসনের জন্য সংগ্রাম করে। যে দল বা জামায়াত এরূপ করে না, বরং

গায়ের ইলাহী শাসন ব্যবস্থায় 'মুসলমান' নামক একটি সম্প্রদায়ের পার্থিব কল্যাণ সাধনে সংগ্রাম করে তারা ইসলামপন্থী নয় এবং তাদের মুসলিম সম্প্রদায় বলাও বৈধ নয়।" টিভিতে জামাতিয়া আলেমগণ এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন, যারা জামাতিয়া ইনকিলাবের সমর্থক ছিল না, যারা জামাতিয়া মওদুদিয়ার সদস্য নয়, যারা বদরিয়া শিবিরের সদস্য কিংবা সমর্থক নয়, ইনকিলাবের পেছনে যাদের অবদান নেই, তারা বংশগত মুসলমান হলেও কার্যত মুসলমান নয়। সুতরাং জামাতিয়া সদস্য–সমর্থক ব্যতীত সকলকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। এ জন্য কেবল জাকাত ও ভূমি কর দিলে চলবে না, 'জিজিয়া' করও দিতে হবে। এই জিজিয়া করের বিনিময়ে বদরিয়া বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী তাদের হেফাজত করবে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

হেফাজত? নিজের মনেই বিড় বিড় করেন নাসিমা আকবর। এই হচ্ছে হেফাজতের নমুনা। আজ তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর সংসার অচল হয়ে পড়েছে। পেটে ভাত পড়েনি।

শেষ রাতে ঠান্ডা পড়ে। বাইরে বোধ করি ফুরফুরে বাতাস বয়। ঘুমিয়ে পড়েন নাসিমা আকবর। স্বপ্ন এসে ভিড় করে তাঁর দু'চোখে।

বেগম ওয়ালিদা রহমান। এক ইফতার পার্টিতে গেছেন। সবাই অপেক্ষা করছে আজানের। আল্লাহু আকবর। আজান হয়। বিসমিল্লাহ। ইফতারীর দোয়া পড়েন সবাই। বেগম ওয়ালিদা রোজা রেখেছেন কিনা কে জানে? তবে ইফতারী করলে সোয়াব আছে। ইফতারীর জন্য বসে থাকায় আরো সোয়াব। বিসমিল্লাহ বলে বেগম ওয়ালিদা এক গ্লাস সরবত মুখে দেন। খেতে খুবই সুস্বাদু। পুরো এক গ্লাস সরবত ঢক ঢক করে পান করেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে খবর হয়ে যায়। তার মুখ বেগুনী হয়ে পড়ে। ঢলে পড়েন তিনি। ছুটোছুটি শুরু হয় মাহফিলে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বেগম ওয়ালিদাকে। কিন্তু তার আগেই মারা গেছেন তিনি। হৈচৈ পড়ে যায় দেশজুড়ে। বেগম ওয়ালিদার সব খাদ্য আগে খেয়ে পরীক্ষা করেন একজন চিকিৎসক। আজো করা হয়েছে। তাহলে বেগম ওয়ালিদা মারা গেলেন কেন?

ওই চিকিৎসককে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হি–হি–হি। সেই চিকিৎসক এখন আমার মহলে। হি–হি–হি। ভেসে ওঠে আতিউর রহমান মিজানীর মুখ। সবটাই জেহাদ। সত্য–মিথ্যা বলতে কিছু নেই। কেতাবে আছে, তিনটি কারণে মিথ্যা বলা জায়েজ। এক. দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করা, দুই. নিজের জীবন রক্ষা করা এবং তিন. যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে বিভ্রান্ত করা। জেহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে এক আধটা খুন–খারাবি করা তেমন ক্ষতিকর নয়। বরং এ হচ্ছে গাজীর কাজ। হি–হি–হি।

ঘুম ভেঙে যায় নাসিমার। শীত করে। তিনি ঘেমে গেছেন। সারাটা শরীর ঘামে ভেজা। ভোরের শীতে তাই কাঁপুনি দেয় শরীর। বাইরে আজান হয়। আল্লাহু আকবর। আল্লাহ মহান।

আগে ভোর হলে পাখি ডাকতো। অন্ধকার আকাশে এক ধরনের হাল্কা শাদা আভা ফুটতো। শিউলি ঝরতো গাছ থেকে। তার বোঁটায় ঝরতো শিশির। ঘুম ভেঙে ঘুমঘুম চোখে তাকাতো নদীগুলো। তখনো তাদের জল ছুটে চলতো কলকলিয়ে। তারপর দিগন্ত আলোকিত করে সূর্য উঠতো। এখনো কি ভোর হয়? তাহলে পাখি ডাকে না কেন? কেন কাটে না এই অন্ধকার?



জ্বীনের মেয়েরা খুব ফর্শা হয়। তারা যখন হাসে, তখন আলো হয়ে যায় পানি, তরল আলো ঝরতে থাকে আকাশ থেকে। যখন কাঁদে, তখন? এতো বিষাদ ঝরে সে কান্নায়, মনে হয়...। একটা জ্বীনের মেয়ে কাঁদছে। পাতালের ভেতরে তার বাড়ি। সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই তার কান্না। বিন বিন করে কান্না। সেই রোদনধ্বনি পৃথিবীর সবটুকু দুঃখ ধারণ করে ঢুকে পড়ে আবদুল হাফিজের বুকে।

আবদুল হাফিজের ঘুম ভেঙে যায়।

কিন্তু কান্নার সেই আওয়াজ থামে না।

পাশে নাফিজার আম্মা নেই।

ঘরের এক কোণে বসে তিনি কাঁদছেন বিনবিনিয়ে। মেয়ের শোক তিনি ভুলতে পারেননি।

আবদুল হাফিজ কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকেন।

তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে আদেশের সুরে বলেন, নাফিজার আম্মা, চুপ করো।

নাফিজার আম্মা! নাফিজা? মেয়ের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা মনে পড়ে যায় নাফিজার আম্মা শাহিদা বেগমের। কি কোমল চাঁদপানা মুখই না ছিল নাফিজার।

সমস্ত মুখমণ্ডল থেকে যেন জ্যোৎস্না ঝরে পড়তো। তিনি চেয়েছিলেন মেয়ের নাম জোছনা রাখতে। কিন্তু সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারেননি মেয়ের বাবাকে। খুবই কম কথা বলা লোক হাফিজ সাহেব। তার ওপর পরহেজগার। ইসলামী নাম ছাড়া কি রাখতে দেবেন মেয়ের নাম?

মেয়ের নানা স্মৃতি উঁকি দেয় শাহিদা বেগমের মনে। তিনি আরো জোরে রোদন করে ওঠেন।

আবদুল হাফিজ উঠে পড়েন বিছানা ছেড়ে। ইদানীং তার মন-মেজাজ মোটেও ভালো যাচ্ছে না। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন, নানা সংশয়। তিনি সে সবের কোনো জবাব পাচ্ছেন না।

তুমি কি চুপ করবা? বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন আবদুল হাফিজ। সব সময় ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না। আরেক বার কাঁদলে ভালো হবে না, আল্লাহর কসম। ঘরের বাইরে রেখে আসবো। জ্বীনে-ভূতে ধরে খাবে।

চুপ করেন নাফিজার আম্মা। আবদুল হাফিজ বলেন, যাও, বিছানায় যাও। এক্ষুণি যাও। না গেলে ঠ্যাং আমি আস্ত রাখবো না। প্রতিটা ঠ্যাং তিন টুকরা করবো। দুই ঠ্যাং হবে ছয় টুকরা।

নাফিজার আম্মা আহত বোধ করেন। আবদুল হাফিজ সচরাচর এরকম দুর্ব্যবহার করেন না। নরম হৃদয় বলে এলাকার দুর্নাম আছে তাঁর।

এ সমাজে বৌ পেটানো একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ আল্লাহতালা নারীজাতিকে পুরুষজাতির অধীন করে দিয়েছেন। কেতাবে আছে, স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো।সুরা

নিসা: ৩৪]। হাদীস কোরানের দয়াধর্ম–পরোপকারিতার কথা এখন ক'জনে মানে, কে জানে, তবে এসব বৌ পেটানো কর্মে অনেকেরই অপার উৎসাহ। সেদিনই এক হুজুরের বাসায় গিয়েছিলেন নাফিজার আম্মা, দেখতে পেলেন তার স্ত্রীর তিনটা দাঁত ভেঙে গেছে পতির প্রহারের চোটে। চাপা ফুলে হয়ে গেছে মোষের পেট।

নাফিজার আম্মা কথা বাড়ান না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। তার মনটা আগে থেকেই খারাপ। স্বামীর ধমক খেয়ে তা আরো খারাপ হয়। চোখ ফেটে জল গড়াতে থাকে, অবিরলভাবে, নীরবে।

তবে তার স্বামী লোক খারাপ না। আশেপাশে অনেকেই এখন নানাধরনের উল্টোপাল্টা কর্ম করছে। পুরুষ মানুষ মাত্রই নাকি এরকম হয়। এক পাত্র জলে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। একাধিক বিয়ে করে। কেউ কেউ চারটা। শুধু কি বিয়ে? তার ওপর থাকে দাসী। তাদের সঙ্গে নাকি এরা সব কিছু করে। পুস্তকে নাকি রয়েছে, 'হজরত জাবের (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম–এর নিকট আসিয়া বলিল : হুজুর, আমার একটা দাসী আছে, সে আমার খিদমত করে। আমি তাহাকে উপভোগ করি অথচ তাহার গর্ভধারণ করাকে আমি পছন্দ করি না। হুজুর বলিলেন, ইচ্ছা থাকিলে 'আজল' করিতে পার।' আবদুল হাফিজ এ হাদীস জানেন। কিন্তু তিনি পরিচারিকা গমনে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, নাফিজার আম্মা, দেখো আমাদের কি ফুটফুটে একখানা মেয়ে। আজ আমি যদি কোনো নারীর অসম্মান করি, কাল আমার মেয়েকে যদি কেউ সে–রকম করে? ফতোয়ার তো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না। সুবিধামতো হাদীস শরীফ থেকে আওড়ানো হচ্ছে। নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিষ্টি খাওয়া সুন্নত এ হাদীস মানি, আর প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে খাবে না, এ হাদীস মানি না। কথায় কথায় বলি, রসুল (দ:) আমাদের নেতা, কোরআন আমাদের সংবিধান। আবার হযরত আবুল আলা মওদুদী ছাহেব বলেন, 'হাদীস কিছু লোক থেকে কিছু লোক পর্যন্ত অর্থাৎ মানুষের মুখে মুখে বর্ণিত হয়ে আসছে। এসব বড়জোর সঠিক বলে ধারণা করা যায়, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায় না। আর একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর ধর্মের যেসব বিষয় এতো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর দ্বারা ঈমান ও কাফেরের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়, সেগুলো কয়েকজন লোকের বর্ণনা নির্ভর করে মানুষকে বিপদাপন্ন করা আল্লাহতায়ালা কখনো পছন্দ করতে পারেন না।' দেখো, কি কথা? হাদীসের ওপর নির্ভর করা যাবে না? এই বলছেন মওদুদী? তাহলে নির্ভর করবে কার উপরে? 'সব সমস্যার সমাধান, দিতে পারে আল কোরআন?' এই স্লোগান দেবে মুখে মুখে আর অন্তরে মেনে নেবে মওদুদী ছাহেবের বাণী 'কোরআন করিম হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু নাজাত বা মুক্তির জন্য নয়?' এই মারাত্মক কথা মওদুদী বলেছেন 'তাফহিমাত' গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায়। কেবল বিবিতালাকের জন্যে হাদীস–কোরআন, আর স্বার্থের বেলায় আমার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত?

সাত–পাঁচ নানা কথা ভাবতে থাকেন নাফিজার আম্মা শাহিদা বেগম। মনে মনে চান, তাঁর স্বামী তাঁর কাছে আসুক, হাত রাখুক তাঁর শিয়রে।

কিন্তু আবদুল হাফিজের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি। তিনি স্ত্রীর কাছে আসেন না। বরং দরোজা খুলে বেরিয়ে পড়েন ঘরের বাইরে। যাবার সময় দরোজার কপাটে জোরে ধাক্কা দেন। মানুষের ক্রোধ শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন বস্তুর ওপর গিয়েই বর্ষিত হয়। কাঠের দরোজা শব্দ করে বিকট।

কোথায় চললেন, এতো রাতে কোথায় চললেন আপনি – বিলাপ করে ওঠেন শাহিদা বেগম। তার কথার কোনো জবাব মেলে না।

বাইরে ঘন অন্ধকার। ঘুঁটঘুটে। আকাশে কোনো তারা নেই। এমনকি জোনাকী নেই কাছে পিঠে কোথাও। শীত পড়েছে খুব। আর ঘন কুয়াশা। সমুদ্রতটবর্তী এ এলাকায় তেমন কুয়াশা পড়ার

কথা নয়। তবুও পড়ে ইদানীং এখানে। স্ত্রীর ওপর রাগ করে প্রায় খালি গায়ে বের হয়ে এসেছেন আবদুল হাফিজ। এখন বড় শীত করে তার, বড় শীত। গা কাঁপতে থাকে, দাঁতে দাঁত লাগে ঠকঠকিয়ে। হাতের তালু বেঁকে আসে প্রায়। তাঁর মাথা ঠান্ডা হয়, উত্তেজনা কমে আসে। হঠাৎ মনে হয়, আমার নাফিজা আম্মার শীত করছে না?

ভূতগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসেন আবদুল হাফিজ। নাফিজার আম্মা, নাফিজার আম্মা। আচ্ছা, বাইরে খুব ঠাণ্ডা। খুবই ঠাণ্ডা। দেখো, আমি শক্ত-সমর্থ জোয়ান মানুষ, আমাকেই কাবু করে ফেলেছে শীত। আর নাফিজা আম্মা এতোটুকুন মেয়ে। পাখির মতো শরীর তার। একা শুয়ে আছে মাটির নিচে। মাত্র একফালি কাপড়ের নিচে। আমার নাফিজা আম্মার শীত লাগছে না? চলো, গোরস্তানে যাই। একটা লেপ দাও। কবরটাকে ঢেকে দিয়ে আসি।

বালকের মতো কাঁদতে থাকেন আবদুল হাফিজ। তাঁকে জড়িয়ে ধরেন শাহিদা বেগম। দুই মানবের অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে অনাদি সমুদ্রের মতো।

আতিউর রহমান মিজানী ছাহেব আরো বুড়িয়ে গেছেন। তবে মনের জোর হারাননি তিনি। জোয়ান থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্বেতশুভ্র গোফ-দাড়ি-ভ্রু-রোম রঞ্জিত করেছেন মেহেদীতে। তাঁর খাস বাদী গুলমোহর অবশ্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে যৌবনবর্ধক সালসা সেবনের। কিন্তু তিনি নিজে জানেন এসব সালসায় যা থাকে তা স্রেফ মদ। মদ্যপান যে তিনি কখনো করেননি, তা নয়। পাকিস্তান ভাঙার গণ্ডগোলের সময় এক মেজর জেনারেল তাকে খুব পেয়ার করতো। সেই তাঁকে বেশ কদিন পান করিয়েছে। পরেও তিনি কয়েকটি বিশেষ দেশের সফররত রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সঙ্গে পান করেছেন। বাইরের এসব দেশের হাতেই তাদের প্রাণভোমরা। তাদেরকে নাখোশ করলে চলবে কেন?

খাদেম মোল্লা এসে জানান দেয়, তাঁর শ্বশুর আবদুল হাফিজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আসতে বলো। অনুমতি দেন আতিউর রহমান মিজানী। শরাবের চিন্তায় তাঁর কেমন নেশা নেশা লাগে। একবার ছেলেবেলায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এক গ্লাস জল খাইয়ে বলেছিল-এ হচ্ছে মদ। উত্তম বিদেশী শরাব। মিজানীর নেশা হয়ে গিয়েছিল। গলা ধরে এসেছিল। নেশার ঘোরে এক ফর্শা ছেলেকে জড়িয়েও নাকি ধরেছিলেন।

আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম। আবদুল হাফিজ ছাহেব এসেছেন। বসেন। বয়স হয়েছে। উঠে বসতে পারি না। কিছু মনে করবেন না, বেয়াদবী নেবেন না। তা না হলে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করতাম। বলেন মিজানী ছাহেব। শরাবের চিন্তাটা তার মাথা থেকে যায়নি, বোঝা যায়।

আচ্ছা, শরাব খেলে কি মানুষের যৌবন ফিরে আসে? না হলে কেন বলা হয় মৃত সঞ্জীবনী সুরা? ইহুদী নাসারারা কি করে আশি-নব্বই বছরেও জোয়ান থাকে? তাঁর যখন ষাট বছর বয়স তখন জোয়ান নামে এক নায়িকার বয়সও হয়েছিল ষাট বছর। সে তখনও ছিল টগবগে জোয়ান। আর তিনি তখনই প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন জোয়ানি।

হুজুরপাক, আমার একটা আরজি ছিল।

জ্বী বলেন, আপনি আমার শ্বশুর। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। তবে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেন। শরাব পান করা কি উচিত না অনুচিত?

কেতাবে হারাম বলা হয়েছে।

যদি কেউ ওষুধ হিসেবে খায়? অল্প করে করে রোজ?

হাদীসে আছে, যা বেশি পরিমাণে খেলে নেশা হয়, তার অল্প খাওয়া নিষেধ। তবে হু্জুর যদি

খেতে চান, খেতে পারেন।

আমি খেতে চাই, আপনাকে কি তা আমি বলেছি?

জ্বী না, বলেননি।

তাহলে?

হুজুর, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বলছি। ধর্মীয় নেতারা যতদিন ধর্মীয় নেতা ছিলেন, ততদিনই ভালো ছিলেন। রাজনৈতিক নেতা হবার পরই পদস্খলন। উমাইয়া খেলাফত থেকে পদস্খলনের শুরু। তবে খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফার তিনজনকেই কেন আততায়ীর হাতে নিহত হতে হলো, তাও চিন্তার কথা। যাই হোক, এরপর মুসলিম খলিফাদের কেউ কেউ যা করেছে, তা বর্ণনার বাইরে। এজিদ এমনকি আগুন দিয়েছে কাবা শরীফে। হজরে আসওয়াদ ভেঙে তিনটুকরো হয়ে গেছে। উমাইয়া খেলাফতের সময়ে হারেম বানানো হয়। মৃগয়া, মদ, নারী, সঙ্গীত, নৃত্য সব চলে দেদার। খোজাদের রাখা হয় দ্বাররক্ষী হিসেবে। এসব অনেক মুসলিম শাসকেরই রপ্ত ছিল। দিল্লি সালতানাতের ফিরোজ শাহ মুহম্মদ বিন তুঘলুগের আমলেও দেখা যায় বিলাস-ব্যসন, ক্রীতদাস ও দাসী নিয়োগের রেওয়াজ, আর মদ্যপানের প্রচণ্ডতা। ইতিহাসে পাওয়া যায়, ওই সময় একজন সুদর্শন বালক বা খোজা বা সুন্দরী বালিকার দাম ওঠানামা করতো ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত।

মিজানী ঝিম মেরে থাকেন। আধো ঘুমে, আধো তন্দ্রায়। বেশ নেশা নেশা লাগে তাঁর। তিনি জানেন, কোনো কোনো এলাকায় অনেক দায়িত্বশীল রুকন এখন এসব বেহেশতী জিনিসে আসক্ত। ক্ষমতা আসলেই মানুষকে নষ্ট করে দেয়। তবে তিনি নষ্ট হবেন না। কারণ তিনি এসব যদি খান, তবে খাবেন ওষুধ হিসেবে। নবযৌবন লাভের সালসা হিসেবে। গুলমোহর বুদ্ধিটা দিয়েছে ভালো।

হ্যাঁ, আবদুল হাফিজ, আপনি বলুন, কি যেন আরজ আপনার?

হুজুরপাক, যদি অন্যায় না মনে করেন, এই মহলের কয়েদখানায় একজনকে আটক রাখা হয়েছে। আমি তার খালাসের আর্জি করছি।

কি নাম তার?

শফি আকবর।

কবে আটক করা হয়েছে?

আবদুল হাফিজ তারিখ বলেন।

মিজানী খাদেম মোল্লাকে ডাকেন। বলেন, ফাইলটা ঘেঁটে দেখো তো, হাফিজ ছাহেবের মামলাটা। খাদেম মোল্লা ফাইল বের করে দেন।

মিজানী শুয়ে শুয়েই ফাইলের দিকে তাকান। চোখে ইদানীং ভালো দেখতে পান না। পড়তে কষ্ট হয়। তবু পড়েন।

শফি আকবর। মালাউনের লেখা গান গাওয়া।

'কঠিন মামলা' - বলেন মিজানী।

খুব কি কঠিন? জানতে চান আবদুল হাফিজ।

কেন, আপনি বোঝেন না। এতক্ষণ খুব তো ওয়াজ করলেন? এতই ইতিহাস আপনার জানা। আমাদের জামাতিয়া ইনকিলাবের ইতিহাসটা পড়েছেন কখনো? শোনেন, আপনার এই শফি আকবর না কি সে গান গেয়েছে। কেবল গান নয় মালাউনের গান। এটা একটা রাজনৈতিক মামলা। সে হিন্দুস্তানের দালাল হতে পারে। হিন্দুস্তান সম্পর্কে আমাদের জায়গাটা পরিষ্কার। এটা আপনি পাবেন ১৯৭১ সালের ইতিহাসে। ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বদর দিবস পালন উপলক্ষে ইসলামী ছাত্রসংঘ এক গণজমায়েতের আয়োজন করে। তাতে ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ 'চারদফা' ঘোষণা করেন। প্রথম ঘোষণা - দুনিয়ার

বুকে হিন্দুস্তানের মানচিত্রে আমি বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না। দ্বিতীয় ঘোষণা : আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোনো বই বা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তাকাদি লাইব্রেরিতে স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকেরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে।' স্মরণ না হয়, *দৈনিক পাকিস্তানের* ৮ নভেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যা দেখুন। কায়েদে আজম কেতাবখানাতেই তো এসব ডকুমেন্টস রাখা আছে। এসব ঐতিহাসিক ঘোষণা তৈরিতে আমার ভূমিকা আছে। আমার খুন–নুন মিশে আছে এই সব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে। এসব আপনারা ভুলে যেতে পারেন, আমি পারি না। আপনি সাফায়েত করতে এসেছেন, কিন্তু আপনার সাফাই আমি রাখতে পারলাম না জনাব আবদুল হাফিজ। আপনি এখন আসতে পারেন। আসসালামু...।



কিছু মনে করবেন না, আমি একটু বেশি কথা বলি, শিক্ষক মানুষ তো, বলেন রফিকুল হক। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেয়ালের কাছে, দেয়ালে আঁকিবুকি আঁকছেন অদৃশ্য চক দিয়ে আর মুছছেন অদৃশ্য ডাস্টার দিয়ে।

শফি আকবর মাথা নাড়েন। তিনি কিছু মনে করছেন না। বরং তাঁর ভালো লাগছে।

জামাতিয়া হাজতখানা থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে কয়েদখানায়। এক কক্ষে এতোদিন তিনি একাই ছিলেন। গতকাল পেয়েছেন একজন সহবন্দীকে। রফিকুল হক। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। ধবধবে ফর্শা। মাথায় অর্ধেক টাক। চোখ দুটো মায়াময় কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। লোকটার বর্ণনায় 'জ্যোতির্ময়' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

গতকাল রফিকুল হক একটিও কথা বলেননি। একটিও না। তাকে এ কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে বদরিয়া বাহিনীর দুজন লোক। তারা পরিচয় করিয়ে দেয়নি। শফি আকবর প্রথমে ভড়কে গেছেন। কে এই জ্যোতিষ্মান? কি তার আগমনের উদ্দেশ্য? আবারো জিজ্ঞাসাবাদ? দশ আঙ্গুলে দশটি সূঁচ? ইলেক্ট্রিক চেয়ার? ১০০টি দোররা? কি জানতে চায় আসলে তারা? তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। এরা যা জানতে চায়, তিনি যতটুকু জানেন, অকপট জবাব দেন। তবুও কেন কাটে না এই অমানিশাপর্ব?

রফিকুল হক কিন্তু তাকে কোনো রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। ঝিম মেরে বসে থেকেছেন মেঝেতে।

কিছুক্ষণ পর শফি আকবরই প্রথম জিজ্ঞাসা ছুঁড়েছেন।

আপনি কি আমার কাছে কিছু জানতে চান?

মুখ খোলেননি রফিকুল হক।

আপনি কি জামাতিয়া মওদুদিয়া থেকে এসেছেন?

নীরব থেকেছে প্রতিপক্ষ।

আপনি কি আমার মতোই একজন কয়েদী?

কোনো উত্তর নেই।

আপনি কি কানে শুনতে পান? প্রশ্নটি করেই জিভ কাটেন শফি আকবর। যদি কানে নাই শুনতে পায় ভদ্রলোক, এ প্রশ্নটিও তো কানে ঢুকবে না তার। লোকটা হয় বোবা, নয় তো কালা– সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু ভোর না হতেই রফিকুল হকের অন্যরূপ। এক নাগাড়ে কথা বলে চলেন তিনি।

আমার নাম রফিকুল হক। আপনার নাম? কি বললেন? শফি আকবর? বা, বেশ ভালো নাম। কবিতা লেখেন নাকি? কবিদের নাম সাধারণত এরকম দুপদের হয়? দুপদের হয় আর কি? বলুন। পারলেন না, দুপদের হয় মানুষ আর পাখি। আপনি কবিতা লেখেন, না ছবি আঁকেন? ওই একই কথা। দুজনেই ইমেজ তৈরি করে। কেউ শব্দে, কেউ রঙে।

এক নাগাড়ে কথা বলে চলেন রফিকুল হক। কথা বলতে গিয়ে আপন মনেই দাঁড়িয়ে পড়েন। দেয়ালটিকে ব্লাকবোর্ড ভেবে লেকচার দিতে থাকেন। শফি আকবর খুব মনোযোগী ছাত্র। এরকম মনোযোগী ছাত্র, বোঝা যায়, বহুদিন পাননি তিনি।

ও, আমি একনাগাড়ে কথা বলে চলেছি। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চাইছি না। দ্যাটস ব্যাড। আপনি প্রশ্ন করুন।

জ্বী, প্রশ্ন করছি। আচ্ছা, বানর কি দ্বিপদী না চতুষ্পদী।

গম্ভীর হয়ে যান রফিকুল হক। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তারপর চুপচাপ বসে পড়েন।

শফি আকবর কি করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তার জন্যে প্রতিদিন দুগ্লাস খাবার পানি বরাদ্দ হয়। একটা গ্লাসে রয়ে গেছে অর্ধেকটা। সেই জল তিনি ছিটিয়ে দেন রফিকুল হকের চোখেমুখে।

খানিকক্ষণ আবার চুপ করে থাকেন রফিকুল হক। একেবারেই বোবার মতো।

ঘণ্টাখানিক পর আবার মুখ খোলেন তিনি। বলেন, কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায়, তবে যা সত্য বলে জানি, যা যুক্তি দিয়ে মানি, কেবল ততোটুকুই বলবো– নাকি?

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন বানর সম্পর্কে। বানর কি দ্বিপদী না চতুষ্পদী এই আপনার প্রশ্ন। বানর আসলে দ্বিপদী আর সামনের পা দুটো হাত। বানর হলো মানুষের পূর্বপুরুষ। ইমেডিয়েট পূর্বপুরুষ। বহুবছরের বিবর্তনের ফলে বানর থেকে মানুষ এসেছে। এই মতবাদটা আপনি চাইলে অবিশ্বাস করতে পারেন। এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। সেই প্রশ্ন ধরে আমরা সন্ধান পাবো নতুন কোনো মতবাদের। প্রশ্ন তুলতে পারলেই কেবল জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব। সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন। আমি কি? আমি কে? পৃথিবী কোথা থেকে এলো?

ডারউইনের মতবাদ লেটেস্ট মতবাদ নয়। এর আগে পরে অনেক তত্ত্ব এসেছে, আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু হচ্ছে না। হতে দেয়া হচ্ছে না। দেখুন, আমি পড়াশোনা করেছি বাইরে। তিনটি সাবজেক্টে পিএইচডি আমার। সবাই বললো, দেশে যেয়ো না। ওটা এক গুমোট অন্ধকার বদ্ধ গুহা। আমি বললাম, যাবো। আলো তো সেখানেই জ্বালাতে হবে, যেখানে অন্ধকার।

আমি এখানে একটা ছোট্ট কলেজে পড়াই। বেসরকারি কলেজ। একজন কোটিপতি তাঁর বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাকে বণ্ড লিখিয়ে নেয়া হলো, আমি অনৈসলামিক কোনো মতবাদ প্রচার করতে পারবো না। আমি দিলাম বন্ডে সই। আমি তো অনৈসলামিক কিছু করছি না। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত হবে না? সবগুলো মতবাদ ছাত্রেরা জানবে না?

সেদিন কজন ছাত্র–পাণ্ডা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। বললো, ওস্তাদজী, আপনি এই দেশের ইতিহাসটা জানেন না। কাজেই ইনকিলাববিরোধী নানা লেকচার ক্লাসে দিচ্ছেন।

আমি বললাম, ইতিহাসটা কি রকম?

বললেন, আজ থেকে তিন যুগ আগেও এদেশে অনৈসলামিক কান্ড কারখানা চলতো দেদার। এদেশে আওরাতদের শাসন কায়েম ছিল।

আমি বললাম, আমার বয়স তোমাদের চেয়ে বেশি। ওই ইতিহাসটা আমার জানা।

আগে শুনুন ওস্তাদজী। ছাত্রপান্ডারা ধমক দিল। বললো, ওই অন্ধকারে নূর জ্বালালেন একজন মহান আলেম। তার নাম হযরত স্যালোয়ার হোসেন দাউদী। তিনি গ্রামে–গঞ্জে ওয়াজ করতে লাগলেন। সেই ওয়াজ থেকে আপনাকে কিছুটা শোনাই। একজন ছাত্র কানে হাত দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে সুরে সুরে ওয়াজ শুরু করলো : 'হায় মুসলমান, সেই মুসলমান, সেই নবীর উন্মত, এক পাতা ইংরেজি বই পড়ে আর বলে, হয়ার ইজ গড? আল্লাহ কোথায়? বলেন, নাউযুবিল্লাহ। মাস্টার সাহেব

ক্লাসে বলে, মানুষ ছিল বান্দর। তার পাছায় লেজ ছিল। সেই লেজ ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। তবে এখনো মানুষের পাছার কাছে লেজের অবশেষ রয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় নিজের পাছা দেখো। ছাত্র-ছাত্রীরা শোনে, আর কাপড়ের নিচে হাত ঢুকায়া দেখে, সত্যি তো লেজের মতো কি দেখা যায়। বলেন, নাউযুবিল্লাহ। এই জন্যেই তো আমি বলি, ওটা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বেশ্যাবিদ্যালয়, ওখানে আহাম্মক শরীফ আর উমর উদ্দিন বদরা বদমায়েসী শিক্ষা দিতেছে। ভাই সাহেবেরা জোরে আওয়াজ দেন, ১২ কোটি মুসলমানের দেশে ডারউইন সিলেবাসে থাকবে?'

উপস্থিত অন্য ছাত্ররা সবাই চিৎকার করে উঠলো 'না'।

আমি ভড়কে গেলাম।

একজন ছাত্র গম্ভীরভাবে বললো, আল্লাহতালা বললেন, কুন। আর সব কিছু সৃষ্টি হলো। তবে সব কিছু সৃষ্টির আগে তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে সৃষ্টি করেন। আর আদম পয়দা করেন মাটি থেকে।

কুরআন শরীফের সুরা ছিজ্দাহ : ২১ পারায় আছে, তিনি আল্লাহ, যিনি ছয় দিবসে আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে সৃজন করিয়াছেন।'

আমি বললাম, হ্যাঁ, এটি একটি মতবাদ। বিজ্ঞানেরও নানা মতবাদ আছে সৃষ্টি নিয়ে। সে সব মতবাদ যে স্থির কিছু তাতো নয়। ক্রমান্বয়ে মানুষ বেশি জানছে সৃষ্টি নিয়ে। যতোই দিন যাবে, ততোই জিজ্ঞাসা বাড়বে। অনেক কিছুর উত্তর মিলবে, বহু কিছুর মিলবে না। বিজ্ঞানের গবেষণা তো থেমে থাকবে না। যুক্তি দিয়ে যতোটুকু মানা যায়, বিজ্ঞান ততোটুকু মানবে। কিন্তু সেটাই তো চূড়ান্ত নয়। কাজেই জ্ঞানের সন্ধান তো থেমে থাকবে না।

ছাত্ররা বললো, কিন্তু চূড়ান্ত কি তা তো আমরা জানি। কোরআন যা বলেছে তাই চূড়ান্ত। সুতরাং এ নিয়ে অন্য কোনো মতবাদ আপনি পড়াবেন না, আলোচনা করবেন না।

দেখো, এ প্রশ্ন পৃথিবীতে বহুবার এসেছে। গ্যালিলিও . . .।

ওরা আমাকে থামিয়ে দিল। বললো, গ্যালিলিও প্রসঙ্গও হারাম। নূরুল ইসলাম নামে একজন ইসলামী বিজ্ঞানী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটির নাম 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে।' সেই বইয়ে কোরআন-হাদীস ও বিজ্ঞানের আলোকে তিনি দেখিয়েছেন, পৃথিবী স্থির। সূর্য তার চারপাশে ঘোরে। আল্লাহতালা বলেছেন, তিনি পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যাতে এই পৃথিবী স্থির থাকে। সুরা ইয়াসিন আয়াত ৩৮-এ আছে 'সূর্য তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমণ করিতেছে, ইহাও সেই পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর মহাবিধান।' সুরা রুম পারা ২১ আয়াত ২৫-এ আছে 'তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থির রহিয়াছে।'

তখন আমি মুখ খুললাম। বললাম, ওই বইটি আমার কৈশোরে আমিও পড়েছি। কোরআন-হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা ওই বইয়ে ঠিক আছে কিনা জানি না, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো খুবই হাস্যকর হয়েছে। ওই বইয়ের ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না।

কি ঠিক হবে, কি ঠিক হবে না, তার সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন না, নেবে আমাদের মুফতীগণ।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তবে তোমরা যে স্যালোয়ার হোসেন দাউদীর তফসিরে কোরআন শুনে এতো কথা বলছো, তিনি ওয়াজ করতে কতো টাকা আগাম বায়না নিতেন তা কি তোমরা জানো?

ওরা বললো, জানি না। তবে নিলেই বা কি এসে যায়।

আমি বললাম, অন্য কোনো আইনে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কোরআন শরীফকে মেনে নিলে যায় আসে। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, এই গ্রন্থের বিনিময়ে কেউ কোনো রকম আর্থিক-সুবিধা নিতে পারবে না। কিন্তু স্যালোয়ার হোসেন দাউদী ছাহেব নিয়েছেন, প্রচুর পরিমাণে নিয়েছেন। ইসলামী বিধান অনুসারে কেউ কোনো ব্যক্তির নাম বিকৃত করতে পারবে না। তবে দাউদী ছাহেব হামেশাই নাম বিকৃত করতেন। একজন সম্মানীয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার নাম বিকৃত

করে তিনি বলতেন– জাহান্নামের ইমাম। আমাদের বাল্যকালে এসব আমরা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি।

ছাত্ররা যুক্তি–তর্কে গেলো না। যুক্তিতর্ক তাদের তেমন পছন্দ নয়। তারা কেবল পারে চাপিয়ে দিতে। তারা বললো, যাই হোক, ক্লাসে আপনি আর উল্টাপাল্টা বলবেন না। বলবেন, সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়। তার নির্দেশে। ব্যাস।

আমি বললাম, তাহলে তো জ্ঞানের বিকাশ হবে না। দেখো, মুসলমানদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র একজন। প্রফেসর সালাম। তিনি বলেছিলেন, আমরা ইহুদীদের সঙ্গে পারি না, কারণ বিজ্ঞানে নোবেলের বেশির ভাগই পেয়েছে ইহুদীরা। মুসলমানদের আগে জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। নইলে তারা কেবল মারই খাবে।

আমার কথা শেষ হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমার কলার চেপে ধরলো।

খবরদার। আব্দুস সালামকে মুসলমান বলবি না।

কেন?

কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। হযরত আবু আলা মওদুদী ছাহেব বলে গেছেন কাদিয়ানীরা কাফের। তাদেরকে হত্যা করা উচিত। তিনটি ক্ষেত্রে হত্যা করা জায়েজ :

১. হত্যার বিনিময়ে হত্যা, ২. বিবাহিত লোক জেনা করলে হত্যা, ৩. কোনো মুসলিম অমুসলিম হয়ে গেলে হত্যা।

তারপর? শফি আকবর জিজ্ঞাসা করেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এরা কি আমার ছাত্র। অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। ১৯৭১ সালে এ রকম কিছু ছাত্রই গিয়েছিল শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি। স্যার, আপনাকে একটু আসতে হবে। সেই শিক্ষকেরা আর ফেরেননি।

শফি আকবর বলেন, তাছাড়া আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে জামাতিয়াদের এই উন্মত্ততা আজকের নয়। পাকিস্তানে মওলানা আবু আলা মওদুদীর ফতোয়া অনুসারে বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল। তারপর সামরিক আদালতে মওদুদীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। পরে সেই দন্ড রহিত করা হয়। আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা দেখেছি, আহমদীয়াদের মসজিদে জামাতিয়াদের হামলা চালাতে। তারা মসজিদে আগুন দিয়েছে, কোরআন শরীফ পুড়িয়ে ফেলেছে আর ইমামদের জখম করেছে।

তাদের এই ক্লাস–ক্লাস খেলা ভালোই চলছিল। একজন বদরিয়া বাহিনীর লোক আসে। কক্ষের দরজা খোলে। দু'জনকে ভালো করে লক্ষ্য করে। তারপর চলে যায়।

আমি কিন্তু আমার ব্রত থেকে সরে আসিনি। রফিকুল হক বলেন। আমি নিয়মিত ক্লাসে যেতাম। বিজ্ঞানের শিক্ষা অকাতরে দান করতাম।

তারপর একদিন ভোরবেলা দরজায় ধাক্কা, আপনাকে একটু আসতে হবে। চলুন, সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। হা–হা–হা।

শফি আকবর এই হাসি দেখে ভড়কে যান। লোকটা বিপদের মধ্যে হাসছে কি করে? তার কি স্ত্রী–পুত্র নেই?

আপনার স্ত্রী–পুত্র কেউ নেই? বাবা–মা–ভাইবোন–আত্মীয়–স্বজন?

থাকবে না কেন? সব আছে। স্ত্রী আছে। দু'টো মেয়ে আছে।

কোথায় আছে? বিদেশে?

না, বিদেশে থাকবে কেন? দিস ইজ মাই কান্ট্রি। আমি কেন এই দেশ ছাড়বো? এখানেই আছে দারাকন্যা পরিবার।

আপনার খারাপ লাগছে না?

লাগবে না কেন? লাগছে। জীবন মাত্র একটা। সেটা কে হারাতে চায়? আমিও চাই আমার স্ত্রী–কন্যাদের নিয়ে আনন্দময় জীবন–যাপন করতে।

তাহলে?

তবুও তো আমি যা সত্য বলে জানি, তা থেকে সরে আসতে পারি না। নাকি পারি?

জ্বী না, পারেন না।

আমাদের ইসলামী রাজনীতিকদের বড় অসুবিধা হচ্ছে এরা বড় অসহিষ্ণু এবং প্রগতিবিরোধী। অনড়। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নাম শুনেছেন? গ্রীক দর্শনের সংস্পর্শে এসে এরা দর্শনের আলোকে ইসলামকে বিচার করতে শুরু করে। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিবেচনা করতে থাকে। ফলে এদের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থীরা খুবই সোচ্চার। কিন্তু এই যে মুতাজিলা সম্প্রদায়, এরা যখন খেলাফত দখল করে, তখন এরাই ভিন্নমতাবলম্বীদের কাতারে কাতারে হত্যা করেছে। সবচেয়ে যুক্তিবাদীদেরই এই অবস্থা! তারপর যখন মুতাজিলারা ক্ষমতা হারায়, তাদেরও হত্যা করা হয়েছে একই কায়দায়।

তো?

এই সমাজে মাথা ও মগজ একই সঙ্গে বাঁচানো মুশকিল। আমি মগজ বাঁচাতে চাই। মাথাটা হারাতে হবেই। আই টু ডাই, ইউ টু লিভ, হুইচ ইজ বেটার, ওনলি গড নোজ।

এরপর রফিকুল হক আবার নীরব হয়ে পড়েন। মেঝেতে বসেন ঝিম মেরে। এখন আর তিনি কোনো কথা বলবেন না। একটি কথাও না।

শফি আকবর আর কোনো প্রশ্ন তোলেন না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। খুব মনে পড়ে নাসিমার কথা। কতোদিন নাসিমার মুখ দেখেন না। নাসিমা কোথায় আছে, কেমন আছে– জানেন না। তাঁর নিজের বিচারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেবল চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। কঠিন দৈহিক ও মানসিক পীড়ন। কিন্তু আদালত বসছে না আর। কোনো রায় পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু একটা রায় পাওয়া গেলে ভালো হতো। তাতে ফাঁসী হলেও মেনে নেয়া যায়। কিন্তু এ রকম আর ভালো লাগে না। কাফ্‌কা'র 'ট্রায়াল'-এর মতো। জোশেফ কে'র বিচার হচ্ছে। কিসের বিচার তিনি জানেন না। এ অফিস থেকে সে অফিস করছেন। উকিলের কাছে যাচ্ছেন। বিচার আর শেষ হয় না। এই জনপদে এখন নেমে এসেছে কাফ্‌কার দুঃস্বপ্নের জগৎ।

শফি আকবর নাসিমার মুখটি মনে করবার চেষ্টা করেন। মনে আসে না। তিনি চোখের জলে আঙুল ভেজান। তারপর মেঝেতে ফুটিয়ে তোলেন নাসিমার মুখ। জলের রঙে।

ছবিটা এঁকেই তিনি ভয় পেয়ে যান। প্রাণীর ছবি আঁকা নাজায়েজ। এই ছবি কেউ দেখে ফেললেই বিপদ।

যেখানে বাঘের ভয়...। বাইরে পায়ের আওয়াজ। কেউ আসছে। বদরিয়া বাহিনীর কেউ।

দরোজা খুলে যায়। একজন ভয়ঙ্কর দর্শন লোক। তার কোমরে তরবারী।

সে ঘরে ঢোকে। পায়চারী করে। এদিক-ওদিক তাকায়।

শফি আকবরের বুক কাঁপে। তিনি ভাবেন, হাতের টানে ছবিটি নষ্ট করে দেবেন কিনা। না, দেবেন না। এটা তার প্রিয়তম মানুষটির মুখ।

লোকটি রফিকুল হকের কাছে যায়।

তাঁকে দেখে। তারপর চলে যায়।

রফিকুল হক ওঠেন। শফি আকবরের কাছে আসেন। শফি আকবর তাকে দেখিয়ে দেন নাসিমার জলে আঁকা ছবিটি।

রফিকুল হক হা-হা-হা করে ওঠেন। ইনি কে? আপনার স্ত্রী? আপনি তো গ্রেট। এ গ্রেট আর্টিস্ট।

হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেন তিনি।

বলেন, আপনি আর্টিস্ট। আপনি ইচ্ছে করলেই প্রিয়মুখখানি এঁকে নিতে পারেন। কিন্তু আমি কি করবো, বলতে পারেন? আমার যে খুব ইচ্ছে করছে, মেয়ে দুটোর মুখ একবার দেখি।



চিঠিটা পড়েই চোখ–মুখ লাল হয়ে যায় আবদুল হাফিজের। অত্যন্ত কুৎসিত ভাষার এক চিঠি। ততোধিক কুৎসিত মনের কাজ। চিঠিটা এসেছে তাঁর স্ত্রী শাহিদা বেগমের নামে। দরোজার নিচ দিয়ে কেউ দিয়ে গেছে। শাহিদা বেগমের হাতে পড়েছে তা। শাহিদা বেগম চিঠিটা খোলেননি। আবদুল হাফিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। আবদুল হাফিজ বসে আছেন জায়নামাজে। এশার নামাজ শেষ করেছেন। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়েন তিনি। কাগজ থেকে আতরের গন্ধ আসে।

চিঠিটা পড়ে খানিকটা স্তম্ভিত থাকেন তিনি। স্তম্ভ নিজেও এতোটা স্তম্ভিত থাকে না।

কি ব্যাপার, কি লিখেছে?

ভয়ে–আশঙ্কায় মুখটা এতোটুকুন করে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন নাফিজার আম্মা শাহিদা বেগম।

তুমি পড়ো। চিঠিটা এগিয়ে দেন আবদুল হাফিজ স্ত্রীর দিকে। নাফিজার আম্মা অল্প–অল্প পড়তে জানেন। প্রাইমারি স্কুলে পড়েছেন তিনি। তিনি যখন স্কুলে ভর্তি হন, তখন দেশজোড়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। মেয়েদের স্কুলে যাবার উপরও জোর দেয়া হয়েছিল খুব। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি। তারপর দেশ জুড়ে গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। মেয়ে–শিশুদের স্কুলে যাওয়াও তখন নিরাপদ ছিল না। তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

শাহিদা বেগম অবশ্য পড়াটা ভুলে যাননি। নিজের বাড়িতে কোরান শরীফ পড়া ছাড়াও বাংলা কিতাব তিনি পাঠ করে থাকেন।

চিঠিটা এ রকম :

নাফিজার আম্মা,

আসসালামু আলাইকুম। পর সমাচার এই যে, আপনার স্বামী আবদুল হাফিজকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবেন। আমরা হইলাম জ্বীনের গুপ্তচর। মানুষদের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের মনের খবর জানাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। ইদানীং আপনার স্বামী খুবই আনমনা থাকেন। সব সময় অস্থির অস্থির ভাব। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তিনি এশকে দিওয়ানা হইয়াছেন। একজন বেগানা আওরাতের ভালোবাসায় তাহার দিল মাতোয়ারা। সেই আওরাত বিবাহিত এবং নিঃসন্তান। প্রায়ই আপনার স্বামীর সহিত সেই মহিলা সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তাহাকে চোখে চোখে রাখিবেন। ইতি

জ্বীন আবদুল্লাহ

শাহিদা বেগম কাঁদতে শুরু করেন।

আবদুল হাফিজের জায়নামাজ থেকে ওঠা হয় না।

হে আল্লাহ, এ কি পরীক্ষার মধ্যে তুমি আমাকে ফেললে।

শাহিদা বেগম বিছানায় যান। তাঁর কান্নার আওয়াজ থামে না।

নাসিমা আকবর গতকালও এসেছিলেন। তাঁর 'আকবরিয়া হরফখানা'র জন্যে আবদুল হাফিজ একজন কর্মচারী ঠিক করে দিয়েছেন। আর বাসায় তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যে দিয়েছেন একজন দাসী। ভদ্রমহিলা প্রায় না খেয়ে ছিলেন কয়েকদিন। তবে তাঁর স্বামীর মুক্তির ব্যাপারে তিনি কিছুই করতে পারেননি। আতিউর রহমান মিজানী এই মামলাটি নিয়েছেন হিন্দুস্তানের চক্রান্ত হিসাবে। শফি আকবরের মুক্তির বিষয়টি তাই খুবই কঠিন।

শাহিদা কেঁদেই চলেছে। তার কাছে যাওয়া দরকার। শফি আকবর ওঠেন।

নাফিজার আম্মা, তুমি কি এইসব কথা বিশ্বাস করেছো?

শাহিদা কোনো কথা বলেন না। তার কান্নার মাত্রাটা বেড়ে যায় কেবল।

নাফিজার আম্মা, কান্নাকাটি করো না।

আপনাকে সব সময় উদাসীন দেখা যায় কেন? কি এতো ভাবেন আপনি সারাদিন? কান্নামাখা স্বরে বলেন শাহিদা।

আবদুল হাফিজ গম্ভীর হয়ে যান। কতো কিছুই তো তার ভাবনায় আসে। কতো চিন্তা, কতো প্রশ্ন।

আমার অনেক চিন্তা বিবি, আমার অনেক ভাবনা।

সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। সংসারের দিকে আপনার মন নেই। আমার দিকে আপনি তাকাবার সময়ও পান না। কি এতো ভাবেন, আমাকে কি বলা যায়?

শাহিদা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন স্বামীর প্রতি। প্রশ্ন করবার মতো সুসম্পর্ক তাঁদের আছে। এই সমাজে এটা খুবই বিরল। এখানে স্ত্রীর অবস্থান স্বামীর অধীনস্থ দাসীর মতো। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে স্ত্রীলোক বেহেশতে প্রবেশ করে। অন্য হাদীসে আছে, হযরত মুহম্মদ (দ:) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং সৎকাজ উপরে ওঠে না। ১. পলায়নকারী ক্রীতদাস যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনিবের কাছে ফিরে এসে আত্মসমর্পণ না করে, ২. যে স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর স্বামী অসন্তুষ্ট এবং ৩. নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধিত না হয়। নবী (দ:) তাঁর উম্মতদের সতর্ক করে গেছেন নারীদের সম্পর্কে, বলে গেছেন তাদের জন্যেই এই এক ফেৎনা তিনি রেখে যাচ্ছেন।

আমার মনে অনেক চিন্তা। জবাব দেন আবদুল হাফিজ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে। আমি এসবের উত্তর পাচ্ছি না। দ্বীন নিয়ে ভাবনা, রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন।

কেমন? তদন্ত অব্যাহত রাখেন শাহিদা। পারলে তিনি ডুবুরী নামিয়ে দিতেন আবদুল হাফিজের অন্তরে। সে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো, মনের গহীনে তার কোনো জায়গা তৈরি হয়েছে কিনা নাসিমা আকবরের জন্যে। ঈর্ষা বড় স্বতস্ফূর্ত, সন্দেহের দাহিকাশক্তি বড় বেশি।

এই ধরো, আমরা যা করছি, ইসলামের নামে যে শাসন চালাচ্ছি, তা কতোটুকু ব্যক্তি স্বার্থে হচ্ছে, দলের স্বার্থে হচ্ছে আর কতোটা হচ্ছে ইসলামী বিধান অনুসারে, আল্লাহ–রাসুলের নির্দেশ অনুসারে?

কি বলতেছেন আপনি এসব? ভয় পাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন শাহিদা বেগম। এমনতর প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হয়নি। তাঁর একমাত্র মেয়ে মারা গেছে আতিউর রহমান মিজানীর হাতে – এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু এই প্রশ্ন তাঁর মাথায় আসেনি।

তোমাকে একটা উদাহরণ দেই। তোমার মনে আছে কিনা, আমি জানি না নাফিজার আম্মা, আমাদের ছেলেবেলায় তাবলীগ জামাতের একটা সম্মেলন হতো। বিশ্ব ইজতেমা বলা হতো এটাকে। হজ্বের পরে এটাই মুসলিমদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ। এখন আর এটা আমাদের দেশে হয় না। হতে দেয়া হয় না। এমনকি তাবলীগ জামাত করাও এদেশে এখন আর সম্ভব নয়। সেটাকে অসম্ভব করে তোলা হয়েছে।

কেন, অসম্ভব করে তোলা হয়েছে কেন?

তুমি জানো না, ছেলেবেলায় একবার আমার ডিউটি পড়েছিল বিশ্ব ইজতেমায়। জামাতিয়া মওদুদিয়ার নবীন কর্মী হিসেবে। আমরা তাদের নানা তদারকি করতাম। কিন্তু তখন বুঝি নাই, মুখে এতো মধু থাকলেও অন্তরে ছিল কতো বিষ। জামায়াত আর তাবলীগ কেউ যে কাউকে দেখতে পারে না, পরে বুঝেছি। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেবের পুত্র হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেছেন, 'মওদুদী জামায়াত একটি রাজনৈতিক ও ক্ষমতালোভী দল। তারা এমন সব জিনিসের প্রত্যাশী যা শরিয়তের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য'। *জামায়াতে ইসলামী কা রুখে কেরদার* বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠায় তুমি এটা পাবে। তেমনি এই তবলিগী জামাতের আদর্শের বিরুদ্ধে হযরত আবু আলা মওদুদী ছাহেব ছিলেন সোচ্চার। তাবলীগ জামাত ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করে না, রাজনৈতিক উন্নতির চেয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই এদের ঝোঁক। এই বৈরাগ্যকে মওদুদী বলেছেন অনৈসলামিক। কেবল তাবলীগের নয়, অন্যান্য অরাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের তিনি অনৈসলামিক বলেছেন। তাঁর মতে 'অনৈসলামিক বৈরাগ্যজনিত অজ্ঞতার আক্রমণ থেকে ওলামা, মাশায়েখ, পীর দরবেশ এবং মোত্তাকী পরহেজগার কারো রেহাই মেলেনি। পরিণামে এই হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বৈরাগ্যজনিত অজ্ঞতার ব্যাধি সংক্রামক আকারে বিস্তার লাভ করে।' এ কথা তিনি বলেছেন *তাজ্জীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন* নামের বইয়ে। কি বুঝলা?

কিছু বুঝতেছি না। যা বুঝেছিলাম, তাও গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

আজ দেখো, ইনকিলাব জিন্দাবাদের জামলে আর একজনও তাবলীগ জামাতের লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। যাবে কোত্থেকে, মওদুদী ছাহেব তো বলেই দিয়েছেন, যারা গায়ের ইলাহী সরকার মিটিয়ে দিয়ে ইলাহী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম না করে তারা মুসলিমই নয়। নাফিজার আম্মা, সুমদ্রের পানি কেন এত লাল, তুমি কি বোঝো?

শাহিদা বেগম বিহ্বল চোখে তাকান। তার চোখের পানি শুকিয়ে আসে। আবার মনে হয় তাঁর চিঠিটির কথা। হায় হায়, জ্বীনের লেখা চিঠি কি মিথ্যা হতে পারে? তিনি আবার জিজ্ঞাসা ছোঁড়েন স্বামীর প্রতি। জ্বীনের লেখা চিঠি সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন না?

আমার কি মনে হয় জানো, জ্বীন-টিন কিছু না। জ্বীন কেন চিঠি লিখতে যাবে? তাছাড়া হাতের লেখাটাও পরিচিত মনে হচ্ছে। এমন হাতের লেখা কোথায় দেখেছি যেন।

একটু দাঁড়াও। আমার ফাইলটা একটু ঘেঁটে দেখি।

আবদুল হাফিজ ফাইল ঘাঁটতে বসেন। নানাধরনের চিঠি। তাঁদের মসজিদে এসেছে। এই মসজিদের খাদেম তিনি। ফাইলপত্র সব তাঁর কাছেই থাকে। বেশির ভাগ চিঠিই টাইপ করা। অল্প ক'টা চিঠি ফরমের মতো। যেটাতে হাতের লেখা আছে, এ রকম একটা ফরম আলাদা করেন তিনি।

নাফিজার আম্মা, তোমার জ্বীনের চিঠিটা নিয়ে একটু এদিকে আসো। নাফিজার আম্মা চিঠিটা নিয়ে আসেন। ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয়।

হ্যাঁ, হাতের লেখা মিলে যাচ্ছে একেবারে। ক এর কান, ধ এর পাগড়ি পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।

ও আল্লাহ, এই হাতের লেখাই তো। চিৎকার করে ওঠেন শাহিদা বেগম।

মসজিদের ফাইল থেকে বের করা চিঠিটা এসেছে মিজানীমহল থেকে। আতিউর রহমান মিজানীর ব্যক্তিগত সহকারীর লেখা চিঠি। দেখলা তো, তোমার জ্বীন থাকে কোথায়? মিজানীমহলে।

আপনি কি মনে করছেন যে, এই চিঠি জ্বীনের লেখা নয়। এমন তো হতে পারে আতিউর রহমান মিজানীর সহকারী একজন জ্বীন। না হলে আপনার মনের কথা তিনি জানলেন কি করে?

তুমি কি জানতে চাও, কি করে জানলেন? আমি মিজানী ছাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, শফি আকবরকে ছেড়ে দেয়া যায় কি না। সে সময় আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম। ইসলামের নামে যে সব করা হচ্ছে তা কতোটুকু ইসলামসম্মত তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার

জামাতা তাতেই যে বেজার হয়েছেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে।

জামাতা? কন্যা হারানোর শোক আবার উথলে ওঠে নাফিজার আম্মার অন্তরে। তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। এদিকে দুটো চিঠির হাতের লেখা এক হওয়ায় আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর অন্তর। মিজানীমহল থেকে এসেছে এই চিঠি। তার মানে, মিজানী মহলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন আব্দুল হাফিজ ছাহেব। জামাতিয়া মওদুদিয়ায় বিরোধীমত সহ্য করা হয় না। না জানি কি আছে তাঁর কপালে?

আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি আর শফি আকবরের হয়ে কিছু করতে যাবেন না মিজানী মহলে। আর এই সব প্রশ্ন আপনি বাইরের কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করুন।

চিন্তিত হয়ে পড়েন আব্দুল হাফিজও। এ জীবনে কমতো দেখলেন না। কতো মৃত্যু, কতো হত্যাকাণ্ড। কেবল আহমদীয়া হবার অপরাধে হত্যা। তাঁর এক বন্ধু ছিল জুবায়ের। তারা ছিল আহমদীয়া। বংশগতভাবেই। বাবা ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনকিলাবের সময়ে তাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে দেয়া হয়। অধ্যাপক সাহেব বাড়ি বানিয়েছিলেন সুন্দর। দোতলা বাড়ি। নাম ছিলো স্বপ্নপুরী। স্বপ্নপুরীতে আগুন লাগে। রাত্রিবেলা চারদিকে পেট্রোল ঢেলে দেয়া হয় আগুন। সবাই আগুনে পুড়ে মারা যায়।

এভাবে তাড়ানো হয়েছে বিধর্মীদেরও। হঠাৎ বাড়িতে আগুন। আর তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধরে আনতো বদরিয়া বাহিনী। গনিমতের মাল। তিনি শুনেছেন উনিশশ একাত্তর সালে এই রকমই করা হয়েছে। এখন নানা জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে ইসলামেরই নানা সম্প্রদায়। মুসলিমদের মধ্যে আছে নানা ভাগ। আছে হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী, হাম্বলী মযহাবলম্বী। আছে খারিজী, শিয়া আর মুরতাজিয়া সম্প্রদায়। ভাগ্য নির্ধারণ বনাম স্বাধীন চিন্তার বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছে দুটি গোষ্ঠি। জাবারিয়া আর কাদেরিয়া। আল্লাহর গুণাবলী বা সিফাত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে দু'টি দল সিফাতিবাদী আর মুসাব্বিহাবাদী। দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মুতাজিলা আর আশারিয়া বিভাজন। আছে ৭২ ফিকরা। শিয়াদের মধ্যেও আছে অনেক ভাগ। যায়েদী, ঈমামী, ইসনা আশারিয়া, ইসমাইলী। আছে সুফীবাদীরা। তাদের মধ্যে কাদেরীয়া, নাখশাবান্দিয়া, সাত্তারীয়া, চিশতীয়া, সানুশিয়া, রিজী, মৌলভী - কতো ভাগ। বংশপরম্পরায় এদেশে সবগুলো মতবাদেরই লোকজন শত শত বছর ধরে বাস করছে। আজ এক মওদুদীবাদ এসে সবাইকে নির্মূল করতে চাইছে। অশান্তি বাড়ছে। রক্তপাত বাড়ছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করছে। শিল্পী-সাহিত্যিক-অভিনেতা-খেলোয়াড়-গায়ক-ম্যাজিশিয়ানরা দলে দলে মারা পড়েছে, দেশ ছেড়েছে। উদ্বাস্তু হয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। যতোই দিন যাচ্ছে, নতুন নতুন ফতোয়া আসছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাড়ছে। বনে-জঙ্গলে ভিন্নমতাবলম্বীরা আশ্রয় নিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অসংখ্য মৃত্যুর সঙ্গে আরেকটি মৃত্যু যুক্ত হলে কিছুই যাবে-আসবে না। নিজের জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন আব্দুল হাফিজ। কি করবেন এখন তিনি? চুপচাপ মেনে নেবেন এই অনৈসলামিক কার্যকলাপ, প্রতিবাদ করে মেনে নেবেন মৃত্যুকে, নাকি পালিয়ে যাবেন এই জনপদ থেকে?

রাত বাড়ে। অন্ধকার গাঢ়তর হয়।

ঢিল পড়তে শুরু করে ছাদের ওপরে। জ্বীনের আছর পড়েছে।

ভয় পেয়ে যান শাহিদা বেগম। সুরা নাস আবৃত্তি করতে শুরু করেন তিনি।

কেমন যেন সন্দেহ হয় আব্দুল হাফিজের। তিনি ছাদে যান টর্চলাইট নিয়ে। ধুপধাপ ঢিল পড়ছে।

টর্চের আলো ফেলেন এদিকে-সেদিকে। দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে জ্বীনেরা। তাদের গায়ে বদরিয়া বাহিনীর পোশাক।



শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায় শফি আকবরের। তিনি উঠে বসেন। তাকান রফিকুল হকের দিকে। কি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন রফিকুল হক। আলো-আঁধারিতে তাঁর মুখখানা দেখায় মেঘলা আকাশে চাঁদের মতো। কি করে ঘুমুতে পারছেন রফিকুল হক? মুখে কোথা থেকে আসে এতো প্রশান্তি? আজ তাঁর জীবনের শেষরাত। একটু পরেই চিরঘুমে নিমগ্ন হতে হবে তাঁকে। অনন্তকাল ঘুমুতে পারবেন তিনি। তাহলে আজরাতে কেন ঘুমিয়ে আছেন রফিকুল হক? একটি রাত জেগে থাকলে তো জীবনের মধ্যখানে থাকা যেত আরো খানিকটা সময়।

গত পরশু বিচার বসে রফিকুল হকের। শফি আকবরকেও নেয়া হয় সে আদালতে। আতিউর রহমান মিজানী ছিলেন আদালতের প্রধান হাকিম। উপস্থিত ছিলেন অনেকের সঙ্গে আবদুল হাফিজও।

অভিযোগনামা পাঠ করা হয় রফিকুল হকের বিরুদ্ধে। তরুণসমাজকে বিভ্রান্ত করা, আর অনৈসলামিক মতবাদ প্রচার করার অভিযোগ। হেসে ফেলেন রফিকুল হক। বলেন, আমি তো অতোটা মহৎ নই। বহু বছর আগে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল। একই ভাষায় অভিযোগ পেশ করা হলে আমাকে অকারণে মহিমান্বিত করা হবে। হেসে ফেলেন আতিউর রহমান মিজানীও। বালিশে আধা শোয়া অবস্থায় একটু নড়েচড়ে তিনি বলেন, না, জনাব রফিকুল হক, অতোটা মহৎ আপনি নন। আপনি তার চেয়েও ছোট। আপনি কার মতো জানতে চান? তাহলে শুনুন– একবার কয়েকজন লোক হযরত মুহম্মদ (দঃ)–এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মদীনায় এসে তারা হয়ে পড়লো অসুস্থ। রাসুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতের উট এনে দুগ্ধ ও মূত্র তাদেরকে পান করতে দিলেন। এসব পান করে তারা সুস্থ হলো। তারপর তারা ধর্মদ্রোহী হয়ে উটের রাখালদের হত্যা করলো আর পালিয়ে গেলো উটগুলো নিয়ে।

আতিউর রহমান মিজানী কথা বলছেন ধীরে ধীরে, তবে শোনা যাচ্ছে স্পষ্টই। এ পর্যন্ত বলে তিনি দম নেন খানিকটা। তারপর বলতে থাকেন, হ্যাঁ, তখন হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনা হলো। তাদের শাস্তি দেয়া হলো। খুব সামান্য শাস্তি। হযরত তাদের হাত দুটো আর পা দুটো কাটা আর তাদের চোখ দুটো উপড়ে ফেলার শাস্তি দিলেন। তারপর তাদের কোনো চিকিৎসা করা হলো না। সে– অবস্থায় তাদের রেখে দেয়া হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়।

আতিউর রহমান মিজানীর কথা শেষ হয়। সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বলে না। মিজানীর চোখ মুখ লাল হয়ে আসে। বোঝা যায়, তিনি কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মিজানী বলেন, জনাব রফিকুল হক, আপনার অবস্থা তো ওই ধর্মদ্রোহীদের মতোই।

আবদুল হাফিজ বিচলিত বোধ করেন। আদালতের রায় কোনদিকে মোড় নিচ্ছে– বুঝতে পেরে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি উঠে দাঁড়ান। বলেন, হুজুর, আমার একটা কথা। রফিকুল হকের সঙ্গে এই ধর্মদ্রোহীদের তুলনাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। কারণ ওই ধর্মদ্রোহীরা নরহত্যা করেছিল। আল্লাহতালা কোরআনপাকে নরহত্যার সাজা হত্যা বলে নির্দেশ দিয়েছেন। হয়তো সে কারণেই রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন। আতিউর রহমান মিজানী গম্ভীর হয়ে পড়েন। আবদুল হাফিজের মতিগতি ইদানীং ভালো মনে হচ্ছে না তাঁর। নানাভাবে তিনি তাকে সাবধান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেতো সোজা হচ্ছে না।

শুধু খুনের বদলা খুন, তা নয়– বলেন মিজানী। মুরতাদের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড।

হযরত আকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– কয়েকজন মুরতাদকে হযরত আলী (রাঃ)–এর কাছে ধরে আনা হলো। তিনি তাদের হত্যা করলেন আগুনে পুড়িয়ে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ জেনে বললেন– যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ)–এর নিষেধবাণীর জন্যে তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করতে দিতাম না। কেন না, হযরত (দঃ) বলেছেন– আল্লাহর শাস্তি দ্বারা তোমরা কাউকে শাস্তি দিও না। আমি হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ)–এর নির্দেশ মতো নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করতাম কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে নয়, কারণ তিনি বলেছেন– যারা তাদের ধর্ম বদল করে, তাদের হত্যা করো।

আবদুল হাফিজের কপাল কুঞ্চিত হয়, স্পষ্ট চিন্তারেখা দেখা দেয় সেখানে। তিনি আর্ত বোধ করেন। এই যে এভাবে জামাতিয়া আদালতের নামে একে একে মানুষকে ধরে এনে এনে হত্যা করা হচ্ছে, হাত কাটা হচ্ছে–এসব কি ঠিক হচ্ছে। কে ধর্মদ্রোহী, আর প্রকৃত ধার্মিক– এ সওয়ালের জবাব কে দেবে? তার মনে পড়লো সেই ইতিহাসের কথা। হোসেনপুত্র মনসুর হাল্লাজের কথা (৯২১ খৃষ্টাব্দ)। তিনি বলতেন, 'আনাল হক'। আমিই সত্য। হক আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের একটি। তখন ফতোয়া দেয়া হলো, এ ব্যক্তি নিজেকে খোদা বলে দাবি করছে। একে হত্যা করো। তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু পরবর্তীকালে সকল ইসলামী চিন্তাবিদ একমত যে, মনসুর হাল্লাজ ছিলেন একজন পরহেজগার মানুষ। এই শাস্তি অন্যায় হয়েছে। ভুল হয়েছে। এ বিশ্বের সবকিছুই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আমার নিজের তো কিছুই নয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই আমার অস্তিত্ব। এমনি এক দর্শনের ভিত্তিতে তিনি বলতেন 'আনাল হক'। সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র নামে জিকির করতে করতে তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। এমনকি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাঁকে হত্যা করার সময় তাঁর রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, আর সেই রক্তে লেখা ফুটে ওঠে 'আনাল হক'।

আবদুল হাফিজ আবার দাঁড়ান। তিনি বলেন, কিন্তু রফিকুল হক যে ধর্মদ্রোহী, এমনতো কোনো অভিযোগ নেই। তিনি তো বলেননি, আমি ধর্মকর্ম মানি না।

ধর্মকর্ম মানি না– একথা বলার চেয়ে কঠিন অপরাধ করেছেন রফিকুল হক। তিনি ছাত্রদের পড়িয়েছেন ডারউইনের তত্ত্ব। এটা স্পষ্টই কোরআন শরীফের বিরুদ্ধাচরণ।

রফিকুল হক সব কথা শুনে যান চুপচাপ। গভীর নীরবতা ভর করেছে তাঁকে, তিনি কিছুই বলেন না।

আবদুল হাফিজ বলেন, না, তিনি যা পড়িয়েছেন, তার সত্য–মিথ্যা বড় কথা নয়, তিনি তো এসব কোরআন শরীফের বিকল্প হিসেবে পড়াননি। তিনি ক্লাসে তাঁর বিষয়ে নানা বই–পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। এ ব্যাপারে রফিকুল হক সাহেব কি কিছু বলেছেন?

সবাই তাকায় রফিকুল হকের দিকে। রকিুল হক নীরবতা ভাঙেন। বলেন, আমাদের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। এর প্রথমেই কেন 'লা ইলাহা' বলা হলো? এর মানে কি? কোনোই উপাস্য নেই। তারপর বলা হলো, ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া। এর ব্যাখ্যা কি? এর

ব্যাখ্যা এই যে অতীতের যতো বিশ্বাস, যতো সংস্কার, সব প্রথমে অস্বীকার করা হলো। তারপর শাদা পৃষ্ঠার মতো শূন্য হৃদয়ে লেখা হলো আল্লাহ্‌র নাম। জ্ঞানচর্চার মূল ব্যাপারটিও তাই। প্রথমে সব সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। সব বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে হবে। তারপর জানার চেষ্টা করতে হবে, সত্য কি? আমি সেই জ্ঞানের সন্ধানই করছি।

মিজানী বলেন, কিন্তু তাই বলে ঈমান আকীদা তো বিসর্জন দেয়া যায় না। কোরআন শরীফই হচ্ছে সব জ্ঞান–বিজ্ঞানের উৎস।

আব্দুল হাফিজ আবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকেন নিজের কাছেই। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, 'কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে (মুসলমান) কাফের বলবে না; কিন্তু কাউকে কোনো ব্যক্তি কাফের বললে সে যদি কাফের না হয় তবে যে ব্যক্তি তাকে কাফের বলেছে সেই নিজেই তখন কাফের হয়ে যাবে। আর যাকে কাফের বলা হয়েছে সে যদি সত্যি সত্যি কাফের হয় তবে, সে আর কাফের থাকবে না, তার কুফরত্ব যে ব্যক্তি কাফের বলেছে তার ওপর বর্তাবে।' কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা কে দেবে? মাওলানা আবুল আলা মওদুদী? তিনি তো ব্যাখ্যা করেন ইচ্ছামতো। ইংরেজ আমলে তিনি সাফাই গেয়েছেন ইংরেজ শাসকের, পাকিস্তান আমলে তিনি প্রথমে বললেন, শরিয়ত–ভিত্তিক নয় এমন সরকারের পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। পরে দেখা গেলো, তার অনুসারীরাই ঢুকে পড়ছে নানা সরকারি পদে। একবার বললেন, নারীনেতৃত্ব হারাম, পরে এক নারীর জন্যে ভোট প্রদানকে 'ফরজ' বলে ফতোয়া দিতেই তার মুখে বাধলো না। স্যালোয়ার হোসেন দাউদী? তিনিও ফতোয়া দিলেন নারী নেতৃত্ব হারাম, অথচ সেই নেতৃত্বের সঙ্গে আপোষ রফা করে পার্লামেন্টে মহিলা সদস্য দিতে তাদের বাধলো না।

আবদুল হাফিজ আবার উঠে দাঁড়ান। জ্ঞান–অর্জন করা ফরজ। আল্লাহর নবী বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করতে হলে সুদূর চীন দেশেও যাও। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো রকম কূপমন্ডুকতার স্থান ধর্মে নেই, ইসলামে নেই। হাদীস শরীফ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, যদি কেউ একটি শুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ করে তবে সে সোয়াব পাবে, আর যদি কেউ একটি ভুল হাদীস সংগ্রহ করে, তবে সেও সোয়াব পাবে, তবে তা হবে শুদ্ধ হাদীসের সোয়াবের অর্ধেক। এ থেকে বোঝা যায়– জ্ঞান অর্জনের পথে, অন্বেষণের পথে যদি ভুলভ্রান্তি হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

আতিউর রহমান মিজানী ক্ষেপে ওঠেন। ধমক দিয়ে বলেন– আবুল হাফিজ, বানিয়ে বানিয়ে ফতোয়া দেবেন না। এই আদালত পরিচালিত হয় আমাদের জামায়াতের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে। আপনি জানেন, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন এদেশে নারী নেতৃত্ব কায়েম ছিল, তখনো এদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইন পড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আজ এতো দিন পরে সেই সমুদ্র তীরে, শিক্ষায়তনগুলোতে ছাত্রদের শেখানো হবে ডারউইনের নাম, তা হয় না। যা হোক, এখন কিছু প্রশ্ন করা হবে রফিকুল হককে। একজন উঠে দাঁড়ায় জেরা করার জন্যে। প্রশ্ন সে লিখে এনেছে।

রফিকুল হক, আপনি বলুন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হলো?

নানা থিয়োরি আছে এর। যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই নতুন নতুন মতবাদ পাওয়া যাচ্ছে। একটি মতবাদ হলো– বিগ ব্যাং মতবাদ।...

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, পৃথিবী এলো কোথা থেকে?

পৃথিবী ছিল সূর্যের একটা অংশ।...

ব্যাস, ব্যাস। আর বলতে হবে না। এই যথেষ্ট। আমি আমার জেরা শেষ করছি।

আতিউর রহমান মিজানীর চোখ মুখ লাল হয়। তিনি এবার রায় ঘোষণা দেবেন, এক ভারি নীরবতা নেমে আসে আদালত কক্ষে। মিজানী গম্ভীর স্বরে বলেন, রফিকুল হকের নামটি

মুসলিমের। জন্মগতভাবে সে একজন মুসলিম। কিন্তু কার্যকলাপ মোটেও ইসলামসম্মত নয়। বরং ইসলামবিরোধী। ইসলামের মূল বিষয়গুলো সে অস্বীকার করে। সে মুরতাদ। তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করছি।

রফিকুল হকের মুখে কোত্থেকে একটুকরা আলো এসে পড়ে। শফি আকবর তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। অপার্থিব আলোয় ঘুমের ঘোরেই হাসছেন রফিকুল হক।

একটু পরে আজান হয়। প্রহরীরা এসে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

ঘুম থেকে ওঠেন রফিকুল হক। শফি আকবর কি বলবেন তাকে, বুঝে উঠতে পারেন না। পরিবেশটা হাল্কা করেন রফিকুল হকই। বলেন, বেশ ভালো ঘুম হলো। শেষ দিকে অবশ্য একটা স্বপ্ন দেখলাম। মিষ্টি স্বপ্ন। দেখলাম, একটা ছোট্ট ঝরনা। রোদ চারদিকে। ঝরনার তলে রঙিন পাথর। আমি তীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি সেই পাথরের দিকে। একটা রঙিন পাথর তুললাম হাত দিয়ে। হাতে ওঠার পর সেটা মাছ হয়ে গেলো। ভারি মিষ্টি স্বপ্ন, না? হাসতে থাকেন রফিকুল হক।

তারপর গোসল সেরে আসেন। ভালো করে গা মোছেন। রাতের পোশাক ছেড়ে পরেন কয়েদখানারই নতুন ধোয়া পোশাক।

ফজরের নামাজটা সেরে নেন ঘরেই। তার মতে এই জামায়াতিয়াদের পেছনে নামাজ কবুল হয় না। নামাজ ঘরে পড়াই ভালো। শফি আকবর তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন অবাক দৃষ্টিতে। আদালতে এ লোকটি যদি বলতো–দুনিয়া বানিয়েছেন আল্লাহতালা ছয়দিনে, আর আদমকে তিনি বানিয়েছেন মাটি থেকে–তাহলেই এ লোকটা প্রাণে বেঁচে যেতো। তা তিনি কেন করলেন না? নাস্তিকই যদি হবেন তাহলে তিনি কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন? রফিকুল হককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা উচিত হবে না। আজ তাঁর শেষ দিন। শেষ দিনে তত্ত্বালোচনা নাই করলেন।

বদরিয়া বাহিনীর দু'জন লোক আসে ঘরে।

রফিকুল হক, আপনি কি প্রস্তুত? আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হ্যাঁ আমি প্রস্তুত।

কেঁদে ফেলেন শফি আকবর।

রফিকুল হক তাঁর কাছে আসেন। তাঁর মাথায় হাত রাখেন। বলেন, এই অল্প কদিনেই আমি আপনাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। আপনার মতো মানুষ হয় না। আসলে আপনি শিল্পী। সংবেদন নিয়ে আপনাদের কাজ।

শফি আকবরের কান্না আরো বেগবান হয়। রফিকুল হক হাসি ছড়িয়ে বলেন, কাঁদছেন কেন? কাল রাতে আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে। খুব ভালো ঘুমে স্বপ্ন দেখা যায় না। আমি তখন কোনো স্বপ্ন দেখিওনি। মৃত্যু হচ্ছে এমনি এক ঘুম। খুব ভালো ঘুম। তবে ঘুম খারাপ হলে মুশকিল। নানা রকমের স্বপ্ন দেখতে হয়। মৃত্যু হচ্ছে এমনি এক ঘুম, যাতে কোনো স্বপ্ন নেই। খুবই সহজ ব্যাপার।

বদরিয়া দুজনের সঙ্গে অবলীলায় হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যান রফিকুল হক। তাঁর জ্যোৎস্নার মতো হাসি ছড়িয়ে থাকে সারাটা ঘরে।



আমাদের রাজধানীর নাম বদলে রাখা হলো জাহাঙ্গীরনগর। এদেশে কোনোরকম হিন্দুস্তানি চাল চলতে পারবে না। ঢাক কিংবা ঢাকেশ্বরী– কোনোটাই ইসলামসম্মত নয়। এসব হিন্দুয়ানির দিন শেষ হয়ে গেছে। ময়মনসিংহ নয়, মোমেনশাহী। শ্রীহট্ট থেকে সিলেট– উহু, অসম্ভব। এর নাম জালালাবাদ।

একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি এ বয়ান করে চলেন। সম্মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্রোতা। একজন উঠে দাঁড়ায়। জালালাবাদ নাম রাখা কি ঠিক হবে? হযরত শাহজালাল (রাঃ) তো মওদুদীবাদী ওহাবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুফী সাধক। আমরা তো এ ধরনের তরিকায় বিশ্বাস করি না। মওদুদীবাদী কেউই সুফীবাদে বিশ্বাস করে না। হযরত আবু আলা মওলানা মওদুদী (রাঃ) এ–ধরনের বৈরাগ্যকে বলেছেন ব্যাধি। এরকম একটা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নামে একটা শহরের নাম রাখা কি উচিত হবে?

খামোশ। চেঁচিয়ে ওঠেন প্রথম বক্তা।

ঘুম ভেঙে যায় আব্দুল হাফিজের। এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ইদানীং তার ঘুম খুব একটা ভালো হয় না। এ ধরনের নানা চিন্তা এসে তার ঘুমের অবিচ্ছিন্নতাকে ভেঙে দেয়।

এখন গভীর রাত। বাইরে নানা শরীরী আর অশরীরী প্রাণীর চিৎকার – ঝিঁঝি, পেঁচা আর জ্বীন পরীদের। ঘরের ভেতরে অন্ধকার। অন্ধকার ঘরের বাইরেও।

পাশেই তার নিদ্রিতা স্ত্রী। ঘুমুচ্ছে অঘোরে। বেচারা। ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। তার ঘুমের উপরেও এখন হামলা চলছে। এই অল্প বয়সেই সে হারিয়েছে তার একমাত্র কন্যাকে, এখন স্বামীর উপরে তার যে বিশ্বাস আর নির্ভরতা, তার উপরেও এসেছে হামলা। চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে গেছে সে। ইদানীং খুব একটা কথা বলে না। চুপচাপ কাঁদে। কাল বিকেলে আছরের নামাজের জায়নামাজে বসেছিলেন আব্দুল হাফিজ। মোনাজাত করতে সবে হাত দু'টো উপরে তুলেছেন। শাহিদা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জায়নামাজে। নাফিজার আব্বা, আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

নিশ্চয়ই দেবো। নিশ্চয়ই দেবো।

আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন?

খুবই ভালোবাসি। অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসি।

আচ্ছা, ঠিক আছে। উঠে যায় শাহিদা। তার চোখের জলের মধ্যেও এক অনাবিল হাসি খেলা করে ওঠে।

বাইরে ধুপধাপ আওয়াজ হয়। ঢিল পড়ছে ছাদে, বেশ বোঝা যায়। জ্বীনের উপদ্রব ইদানীং বেড়ে গেছে, ভাবেন আব্দুল হাফিজ।

জ্বীনগুলোও সব মওদুদীবাদী। তারা ঢিল ছোঁড়ে তাই তাঁর বাসায়। মওদুদীবাদ নিয়ে কোনো রকম ভিন্নমত তাদের পছন্দ নয়।

অথচ যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই মওদুদীবাদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন আব্দুল হাফিজ। ইদানীং ইসলামের নানা বইপুস্তক তিনি পাঠ করেছেন গভীর মনোযোগ আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে।

এই যে রফিকুল হককে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে, শ্রেণীকক্ষে নানা অনৈসলামিক মতবাদ আলোচনা করার অপরাধে, এটা কি ঠিক হলো? রফিকুল হক, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, নামাজ পড়তেন নিয়মিত। তাহলে তাকে মুরতাদ বলা হলো কেন? মুরতাদের শাস্তি কি সত্যিই মৃত্যুদণ্ড?

বিছানা ছাড়েন আব্দুল হাফিজ। তাঁর সংগ্রহে আছে অনেকগুলো বই, বেশির ভাগই ইসলামিক গ্রন্থ। আলমারির কাছে যান তিনি। রফিকুল হকের মুখখানা বারবার মনে পড়ে তাঁর। ইমাম গাজ্জালীর বই 'ফয়সল আত্-তফরিক্কা বয়ন আল ইসলাম ওয়া-য-যান্দাক্কা'। এ বইয়ে ইমাম মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন, তারা যেন যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বা প্রমাণ ছাড়া কাউকে অমুসলমান না ভাবে। কেউ যদি নিজেকে অমুসলমান ভাবে, তাহলেও সে অমুসলমান হয়ে যায় না। হয়তো এমনো হতে পারে, মুসলমানের সংজ্ঞাই তার জানা নেই।

এটা পড়ে হাসি আসে আব্দুল হাফিজের। মুসলমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন মওলানা মওদুদী – কেবল জামাতিয়া সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকারীই মুসলমান। মওলানা স্যালোয়ার হোসেন দাউদী তো আরো এককাঠি সরেস। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর আগে এক নির্বাচনের প্রাক্কালে বলেছিলেন, জামাতিয়াদের ভোট দেয়ার মানে বেহেশতের টিকেট হাতে পাওয়া।

আব্দুল হাফিজের মনে পড়ে একটি হাদীস। মিশকাত আল মাসাবীহ গ্রন্থে ঠাঁই পাওয়া। হযরত আবু জর আছেন হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সঙ্গে। আবু জরকে হযরত বললেন : আমি আমার অন্তরে শুনতে পেয়েছি, জীব্রাইল ফেরেশতা বলেছেন, যে-কেউ এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে মারা যায়, সে-ই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। আবু জর জিজ্ঞাসা করলেন, সে যদি জেনা কিংবা চুরি করে তবুও? আবু জর তিনবার করলেন একই প্রশ্ন, আর তিনবারই পেলেন একই জবাব।

এর অর্থ কি দাঁড়ালো? কে কাকে মুরতাদ বলবে? তবে যে রফিকুল হককে হত্যা করা হলো? শুধু কি রফিকুল হক? লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে ভিন্নমতের কারণে, অমুসলিম আখ্যা দিয়ে। যারা যারা কওমী লীগ করতো, তাদের হত্যা করা হয়েছে হিন্দুস্তানের দালাল বর্ণনা করে। ইনকিলাবের পর সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ দেশে থাকবে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করেছে জামাতিয়া মওদুদিয়া। এ নিয়ে কোনো মতান্তর সহ্য করা হয়নি। এদেশে বেশিরভাগ মানুষই ছিল হযরত আবু হানিফার অনুসারী সুন্নী মুসলমান। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ওহাবী মওদুদী মতবাদ। কেউ ভিন্নমত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মুরতাদ বলে কল্লা নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তো তবু এক ধরনের বিচার-আচার আছে, শুরুর দিকে তাও ছিল না। এক রাতেই হত্যা করা হয় লক্ষাধিক বামপন্থী ও কওমী লীগারকে। এ সব কি ঠিক হয়েছে? অল্প বয়েসের উত্তেজনায় আব্দুল হাফিজ সময় পাননি এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার। আজ নাফিজার মৃত্যু আর বয়সের ভার তাকে শিখিয়েছে প্রশ্ন তোলা। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।' আল্লাহ নিজে বলেছেন, মত-মতান্তরের বিচারের ভার তার নিজের হাতে, সে বিচারের দণ্ড কি মানুষ নিজ হাতে তুলে নিতে পারে?

সূরা গাশীহায়হতে বলা হয়েছে, 'মানুষ উপদেশ না শুনলে আল্লাহ তাদের মহাশাস্তি দেবেন, মানুষ যখন আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। মানুষের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ ও তাদের মহাশাস্তি দেয়া আল্লাহরই কাজ।' তাহলে? এই মিজানী মহল, এই জামাতিয়া আদালত, এই পাঞ্জা কেটে

ফেলা, এই গর্দান নামানো– ধর্মীয় মতভেদের জন্যে, রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্যে– এসব কেন চলছে? আব্দুল হাফিজ এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পান না।

দিন কয়েক হলো এক নতুন এলার্ন জারি হয়েছে। বলা হয়েছে, এতোদিন যে ভাষায় কথা বলেছি আমরা, তা হিন্দুয়ানি। রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাকার ইসলামের জানী দুশমনদের দ্বারা প্রবর্তিত। এ ভাষা বদলাতে হবে। ইতিমধ্যেই শহর–নগর–গ্রামগঞ্জের নাম বদলে ফেলা হয়েছে। রামপুরা হয়েছে রহিমপুরা। এখন মুখের ভাষা বদলানোর জন্যে গঠন করা হয়েছে কমিটি। এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে কি করে বাংলা ভাষার খৎনা করে মুসলমানি বাংলা ভাষার প্রচলন করা যায়। এখন রেডিও–টেলিভিশনে এই মুসলমানি পাকবাংলা ভাষার জোশ চলছে, চলছে বাহাস। আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে তখনকার আমীর গুল–মে আযম বলেছেন, 'যে ভাষায় এখন সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তা হিন্দুদের প্রবর্তিত। হিন্দুস্তানের ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে পাক বাংলাস্তানের ওপর। আমাদের মুসলমানি পাক বাংলা ভাষায় কথা বলতে হবে।' হযরত গুল–মে আযমের বাণী কেউই অগ্রাহ্য করতে সাহস পায় না। এদেশে মওদুদী আর গুল–মে আযমের আদেশ–নির্দেশকে মনে করা হয় হাদীস–কোরআন শরীফের মতোই পবিত্র আর অখণ্ডনীয়, অলংঘনীয়। বাংলা ভাষায় হিন্দুয়ানি গন্ধ আছে, এ ফতোয়া পাকিস্তান আমলেও গুল–মে আযম প্রমুখ দিয়েছেন। এতে ইসলামী ভাবধারা ঠিক প্রকাশিত হয় না। পাকিস্তান আমলে তারা বলতেন, উর্দুই হচ্ছে সাবলীল মুসলমানি ভাষা।

আবদুল হাফিজ ব্যাপারটি ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। কোনো ভাষা কি বিধর্মীর ভাষা বলেই নাপাক, কিংবা কমজোরি হতে পারে? আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা দেব–দেবীর পূজা করতো, এমনকি কাবা শরীফের ভেতরে তারা বিগ্রহ স্থাপন করেছিল, কিন্তু তাই বলে কি আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফের ভাষা আরবি রাখেননি?

গতকাল আবদুল হাফিজ একত্রিত হয়েছিলেন কয়েকজন বিশ্বাসভাজন বন্ধুর সঙ্গে। তারা সবাই এক সঙ্গে ইনকিলাবের সময় কাজ করেছেন। এদের মধ্যে একজন আসাদ বিন হাফিজ। আসাদ মূলত কবি। ইনকিলাবের আগে সে অনেক কবিতা লিখেছে। ইনকিলাব–উত্তরকালে কবিতা লেখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সে এখনো নিজের ঘরে লুকিয়ে–ছাপিয়ে কবিতা লেখে। সেইসব কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয় না। মাসে দু'মাসে একদিন সে দাওয়াত করে নিজের বাসায় খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের। গতকাল ছিল এমনি এক গোপন কবিতা পাঠের আসর।

আসাদ বিন হাফিজ তার কবিতার খাতা নিয়ে আসে। বলে, কবিতা পড়ার আগে ভূমিকা করা আমি তেমন পছন্দ করি না। কিন্তু আজ আমি একটুখানি ভূমিকা করবো। গত সাতদিন আমার মনটা ভালো নেই। এই কবিতাটি সেই মন–খারাপ অবস্থায় লেখা – কবিতার নাম : জবান।

আল্লাহ আমাকে জবান দিয়েছে, শুকরিয়া হাজার
আল্লাহ আমার জবান নেবেন, ইচ্ছামাফিক তার।
পাখির ভাষায় পাখিরা ডাকবে, নদীর ভাষায় নদী,
আমার ভাষায় আমিই লিখবো, কথা কবো নিরবধি।
আমার কবিতা আমার শব্দ আল্লাহর কাছে দায়ী,
মানুষ কেন তা বেঁধে দেবে বলো, মেনে নিতে নাহি চাহি।

সবাই স্তব্ধ হয়ে যায় এ কবিতা শুনে। ভাষার উপাদান শব্দ, একজন কবির চেয়ে বেশি কে আর বোঝে শব্দের প্রতি ভালোবাসা। কে কি শব্দে লিখবে, কি শব্দে বলবে, তাও নির্ধারণ করে দেবে রাষ্ট্রীয় আইন? এ প্রশ্ন উপস্থিত সবার মনে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে তুলতে পারছে না এই জরুরী প্রশ্নটি।

মুখ খোলেন আবদুল হাফিজই। শোনা যাচ্ছে, ভাষা কমিটি নাকি নতুন রূপে পাক বাংলা ভাষার কাঠামো দাঁড় করাচ্ছে? তাতে নাকি সব সংস্কৃত শব্দ বাদ দেয়া হবে। পাক বাংলার একটা অভিধানও নাকি তৈরি করা হচ্ছে। এটা কি উচিত হচ্ছে?

উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে আবদুল কাইয়ুম সবচেয়ে নরম প্রকৃতির। তিনি বলেন, হতে পারে, এটা করা হচ্ছে ইসলামী শাসনকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য।

খবরদার।

চিৎকার করে ওঠেন আসাদ-বিন-হাফিজ। ইসলামের নাম এক্ষেত্রে মুখে এনো না। হাফিজ অনেকটা বক্তৃতার ঢঙে বলে চলেন, ইসলাম মাতৃভাষাকে সম্মান করে। এ কারণেই রাসুল তাঁর নিজের মাতৃভাষায় ধর্ম প্রচার করে গেছেন।

কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, এমন কোনো নবী পাঠানো হয়নি, যিনি মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলতেন। কোরআন শরীফে আছে, 'বলো, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠির প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি এবং মুসা ও ঈসার প্রতি যা অনুগ্রহ করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি এবং অন্য নবীরা তাঁদের আল্লাহর কাছ থেকে যে অনুগ্রহ পেয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁদের সাথে কারো পার্থক্য তৈরি করি না এবং আমরা মুসলমান'। তার মানে কোরআন শরীফ বিভিন্ন নবীর মধ্যে পার্থক্য করে না, কাজেই বিভিন্ন নবীর মাতৃভাষার মধ্যেও পার্থক্য করে না।

এবার মুখ খোলেন আবদুল হাফিজ। হ্যাঁ, তাছাড়া আল্লাহর নবী বলে গেছেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। হযরত তো এও বলেছেন, আরবের ওপর অনারব আর অনারবের ওপর আরবের কোনো অধিকার নেই কোনো কিছু চাপিয়ে দেবার, বা কোনো অন্যায় করার।

কবি আসাদ-বিন-হাফিজ এবার একটি ফারসী কবিতা পাঠ করে শোনান। কবি হাকিম সানাইয়ের কবিতা। কবিতার অর্থ :

'ধর্মের কথা যে ভাষাতেই বলো
হিব্রু ভাষায়,
সিরীয় ভাষায়,
আল্লাহর অন্বেষণ করো
সত্যের অনুসন্ধান করো
জাবালকা দেশে
বা জাবালসা দেশে-
ধর্মের কোনো তারতম্য হয় না
সত্যের কোনো তারতম্য হয় না
আল্লাহর কোনো তারতম্য হয় না।

আবদুল হাফিজ বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে হলেও যাও। সালমান নামে এক ব্যক্তি আরবি জানতেন না। নামাজে বিদেশী ভাষা আরবি পড়তে তার অসুবিধা হতো। হযরত মুহম্মদ তাকে ফারসী ভাষাতেই নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন, 'কোরান শুধু আরবি ভাষাতে আসেনি, তা সাত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে'। সাত বলতে আরবিতে বহু বোঝানো হয়। আর তাছাড়া, বলেন আসাদ-বিন-হাফিজ, বাংলাকে সংস্কৃতমুক্ত করে আমরা উর্দুকে তার বিকল্প ভাবছি। কারণ উর্দুর হরফ আরবির অনুরূপ। কিন্তু বাংলা মানেই হিন্দুর ভাষা নয়, আর উর্দু মানেই মুসলিমের ভাষা নয়। হিন্দুস্তানের নেতা জহরলাল নেহরু

উর্দুতে কথা বলতেন, প্রেম চন্দ উর্দুভাষী ছিলেন। সুতরাং ভাষার মধ্যে ধর্ম খোঁজা বোকামি।

আবদুল কাইয়ুম বলেন, তাহলে অনর্থক এই বোকামি কেন করা হচ্ছে?

আসাদ বলেন, যদি আমার এই কথা বাইরে প্রকাশ না হয়, আমি একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি। ইতিহাস বলে, এই অঞ্চলের রাজনীতিকেরা যখনই বিপদে পড়েন তখনই হিন্দুয়ানি-বিরোধী চিৎকার শুরু করেন। তাতে তাদের গদি পোক্ত হয়। ইতিহাস পড়লে জানা যায়-উনিশশ একাত্তর সালেও এরূপ করা হয়েছে। এতে জনগণের মধ্যে জেহাদী জোশ সঞ্চারিত হয়।

এখন ইনকিলাবের পরে সারা দেশ জুড়ে নৈরাজ্য। জনগণ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে- চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দলে দলে লোক দেশত্যাগ করায় কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁতী সম্প্রদায়, কামার, কুমোর, মেথর, ধোপা, নাপিত বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে অমুসলিম ছিল বেশি, এখন তারা নেই। ফলে উৎপাদন কমে গেছে অনেক। পেশাজীবী তৈরি হচ্ছে না, তৈরি হচ্ছে তোমার-আমার মতো মসজিদের খাদেম। আর আছে বিশাল বদরিয়া বাহিনী। যারা বেতন পায়, কিন্তু উৎপাদন করে না। যা আয় হয়, তা ব্যয় হচ্ছে মসজিদ নির্মাণে। সকল মুসলিম পুরুষ যাতে এক সঙ্গে মাগরিবের জামাতে উপস্থিত হতে পারে সেজন্যে মসজিদ হয়ে গেলেই আইন প্রণীত হবে, বাধ্যতামূলকভাবে জামাতে নামাজ আদায়ের। ফলে শিল্পায়ন হচ্ছে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অরাজকতা। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরব দেশগুলো পশ্চিমাদের হুকুমে আমাদের দান-খয়রাত করার সাহস পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বংস। বাজারে খাবার পাওয়া যায় না। কাপড় পাওয়া যায় না। মানুষ অর্ধেক গেছে রক্তপাতে, অর্ধেক যাবে না খেয়ে। এ অবস্থায় যাতে বিদ্রোহ দেখা না দেয় সেজন্যে দরকার নতুন জেহাদী জোশ। সেকারণেই চলছে বাংলাভাষার খৎনা মাহফিল।

সবাই চুপ করে থাকে। এসবই সত্য কথা। সবাই জানে।

আল্লাহু আকবর। বাইরে আজান হয়। ভোর হচ্ছে। আরো একটা নির্ঘুম রাত কাটলো আবদুল হাফিজের। তিনি উঠে বসেন। মসজিদে যেতে হবে। তিনি এ মসজিদের খাদেম। কর্তব্যে অবহেলা তাঁর ধাতে নেই। আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম। ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। তাঁর ঘুম আসে না। অনিদ্রাই কেবল সঙ্গী। অনিদ্রা থেকেও নামাজ উত্তম। তিনি মসজিদের দিকে রওনা হন।



নাসিমা আকবরের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না মোটেই। শফি আকবর কবে বেরুবেন, আদৌ তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে কিনা, কেউ জানে না। আকবরিয়া হরফখানা নামে তাঁদের প্রতিষ্ঠানটির অবস্থাও ভালো নয়। একজন কর্মচারী রেখে প্রতিষ্ঠানটি চালানোর চেষ্টা চলছে, কিন্তু তেমন সুবিধা করা যাচ্ছে না। কারণ গ্রাহকেরা কি চায়, কেমন ছবি, কেমন ক্যালিগ্রাফী– তা তাঁকে বুঝতে হয় কর্মচারীর মাধ্যমে। তিনি নিজে কার্যালয়ে বসতে পারেন না। আবার গ্রাহকদের অফিসে–আদালতে–প্রতিষ্ঠানে যে নিজে যাবেন, কাজ বুঝে নিয়ে আসবেন– তারও উপায় নেই। এ দেশে মহিলাদের সব ধরনের বৃত্তিমূলক কাজে অংশ নেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হযরত আবু আলা মওদুদী ছাহেব বলে গেছেন, ‘ইসলামে যুদ্ধক্ষেত্রে যদিও মহিলাদের দ্বারা আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি ইত্যাদি বাঁধার কাজ করানো হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শান্তি অবস্থায়ও তাদের সরকারি দফতর, কারখানা, ক্লাব ও পার্লামেন্টে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে' – (বিসমি সফি মে ইসলাম, ২৬৩ পৃষ্ঠা)। শুধু কি মওলানা মওদুদী। আছেন অধ্যাপক গুলমেযম। অধ্যাপক গুল–মে আযম মুসলিম পুরুষদের চোখ–নাক–কান–দেহের পবিত্রতার ব্যাপারে ছিলেন নিরাপস। নারীদেহ চোখে পড়লে মুসলিম পুরুষদের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়–এ ফতোয়া তিনি দিয়েছিলেন। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে মহিলারা কসরত প্রদর্শন করে। এরই প্রেক্ষিতে অধ্যাপক গুল–মে আযম বলেন, আজ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাড়ে তিন হাত দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারছি না। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যুবতী মেয়েদের না নাচালে চোখ ঠাণ্ডা হয় না। জামাতিয়া মওদুদিয়ার নগর কমিটির সম্মেলনে তিনি এই উক্তি করেছিলেন। জামাতিয়া মওদুদিয়ার ইতিহাসে সেই বাণী স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আজ নাসিমা আকবরের কর্মচারী আবদুর রউফের সকাল সকাল আসার কথা তাঁদের বাসায়। গতকাল একটা বড় পার্টির সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেক কটা ক্যালিগ্রাফীর ডিজাইনের কাজ। কাজটা পাওয়া গেলে হয়তো কিছু অগ্রিম পাওয়া যাবে। তাঁর অন্ন–সংস্থানের চিন্তাটা আপাতত দূর হবে। এখন অবস্থা এমন যে নিজের দিনযাপনের খরচ তো উঠছেই না; একজন কর্মচারী আর একজন পরিচারিকার বেতনও ঠিকভাবে দেয়া যাচ্ছে না।

দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এই বুঝি আবদুর রউফ এলো। ফতে, ফতে। দেখো তো, আবদুর রউফ এলো কিনা? ফতে নাসিমা আকবরের পরিচারিকার নাম। আবদুল হাফিজ এই পরিচারিকাটি জোগাড় করে দিয়েছেন তাঁর জন্যে।

ফতে দরোজার ছিদ্র দিয়ে তাকায়– কে এসেছে।

বদরিয়া শিবিরের লোক। জনা ছয়েক। ফতে ভয় পেয়ে যায়।

আম্মা, আম্মা। ফতের বুক ধড়পড় করে কাঁপে। গলা শুকিয়ে আসে।

আম্মা। বদরিয়া শিবির। ও আম্মা। বদরিয়া শিবির দরজা ধাক্কায়।

নাসিমা আকবর চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনেও ভর করে নানা আশঙ্কা। তিনি ফতেকে বলেন, যা, গিয়ে বল, কাকে চাই। ফতে দরোজায় যায়।

কাকে চাই?

বাড়িতে কে আছে? বাড়ির গার্জিয়ান কে? দরোজা খোলো।

বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নাই।

এতো সকালে কোথায় গেছে?

কখন এলে পাওয়া যাবে?

পুরুষমানুষ এই বাড়িতে থাকে না। যখনই আসেন, দেখা পাইবেন না।

দরোজা খোলেন। ভয় নাই। বাড়ির গার্জিয়ান যে তাকে ডাকেন। আমরা বদরিয়া বাহিনীর লোক। সরকারি কাজে এসেছি। একটা কাগজ দিয়েই চলে যাবো।

নাসিমা আকবর ফতের পাশেই দাঁড়িয়ে। তিনি দরজা খুলে দিতে বলেন।

আচ্ছালামু আলায়কুম। আমরা আপনাদের এক সমন দিতে এসেছি। এই সমনটা নেন। এটা যে আপনি পেয়েছেন, তার জন্যে খাতার এই জায়গাটায় নামসহি করেন।

এটা কিসের সমন?

পড়ে দেখেন।

নাসিমা আকবর নোটিশটি পড়েন।

আপনাকে এই মর্মে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, এই সমন জারির এক বছরের মধ্যে আপনাকে লিখিতভাবে ঘোষণা দিতে হইবে যে, আপনি নিজেকে মুছলমান মনে করেন নাকি ইজতিমায়ী নিযাম থেকে বাহির হইয়া যাইতে চাহেন। যাহারা নিজেদেরকে মুছলমান ঘোষণা করিবে, তাহাদিগকে আকিদা ও আমল ঠিকভাবে পালন করিতে হইবে। ধর্মের সকল ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলোকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করিতে হইবে। আর যদি আকিদা ও আমল হইতে আপনি মুখ ফিরাইয়া নেন, তবে নিজেকে অমুসলিম ঘোষণা করুন। তাহাতে আপনাকে জিজিয়া করসহ অন্যান্য কর দিতে হইবে।

এরপর একটি ফরম। তাতে নাম ঠিকানাসহ উপরের বক্তব্যের ভিত্তিতে নানা প্রশ্ন। লোকগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। এই সমন পড়ে নাসিমা আকবরও দাঁড়িয়ে থাকেন হতভম্ব হয়ে।

কি হলো? এখানে সই দেন।

আমার দাদা ছিলেন মুছলমান, বাবা মুছলমান, স্বামী মুছলমান, আমিও মুছলমান। এরপর আবার এ– সব কেন?

ও আচ্ছা, আপনার মনেও এই একই প্রশ্ন। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আমরা অবশ্য একই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি। সেজন্যে জবাবটা বানিয়েই এনেছি। এসব কিছু করা হচ্ছে হযরত আবু আলা মওদুদীর পরিকল্পনা অনুসারে। দেখেন আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে মওলানা আবু আলা মওদুদী এরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রস্তুত করেন। সেই রাষ্ট্রে কি কি করতে হবে, তার ফর্মুলাও তিনি লিখে রেখে গেছেন, আপনি এই কাগজটি পড়েন। আপনার প্রশ্নের জবাব আপনি লাভ করবেন।

একটি খাতায় স্বাক্ষর নিয়ে বদরিয়া শিবির সদস্যরা চলে যায়। বিমূঢ় নাসিমা আকবর কাগজটি পড়তে থাকেন।

মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মেঁ

হযরত আবু আলা মওদুদী প্রণীত

'যদি পরে কখনো ইসলামী নিযামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মুরতাদদের কতল সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে বলপূর্বক সে সকল ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়, যাদেরকে মুছলমানের সন্তান হওয়ার কারণে ইসলামের জন্মগত অনুবর্তী বলে নির্ধারণ করা হয়, তবে সেরূপ অবস্থায় অবশ্যই এরূপ আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে যে, ইসলামে ইজতিমায়ী নিযামে বা গণব্যবস্থায় মুনাফিকদের এক বিরাট সংখ্যা যোগদান করবে, যার ফলে সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকবে'।

এ পর্যন্ত পড়ে নাসিমা আকবরের মুখ শুকিয়ে যায়। বাপ-দাদার ইসলাম তাহলে জামাতিয়া মওদুদিয়ার হাত দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে হবে? ফতে, এক গ্লাস পানি আন।

তিনি আবার পড়তে শুরু করেন মওদুদ ছাহেবের বিধান, *'আমার মতে এর সমাধান হলো, যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবে, সেখানে (জন্মগত) মুছলমানদের নোটিশ দিতে হবে যে, যারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়ে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়েছে এবং বিমুখ হয়ে থাকাই পছন্দ করে, ঘোষণার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে তাদেরকে অমুসলমান হওয়ার রীতিমতো প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে ইজতিমায়ী নিযাম থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এ সময়ের পরে যারা মুছলমানদের বংশে জন্ম নেবে, তাদেরকে মুছলমান গণ্য করা হবে। তাদের উপর সম্যক ইসলামী আইন-কানুন প্রয়োগ করা হবে। ধর্মের সকল ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলো তাদেরকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর ইসলামের গণ্ডির বাইরে যেই পদার্পন করবে, তাকেই কতল করা হবে।'*

নাসিমা আকবর স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। এর আগে একবার জামায়াতে মওদুদিয়ার সদস্য না হবার কারণে জিজিয়া কর বসানো হয়েছে। এরপর আবার এসব কি?

বাইরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ। ফতে এসে খবর দেয়, আবদুর রউফ এসেছেন।

কি খবর, আবদুর রউফ, কাজ পাওয়া গেলো?

জ্বী। একটা বাণী বাংলায়, উর্দুতে ও আরবিতে লিখে দিতে হবে। প্রথমত পাঁচশ কপি। রাস্তায় রাস্তায় টাঙিয়ে দিতে হবে।

বেশ বড় কাজ মনে হচ্ছে।

জ্বী, বড় কাজ। কাজটা পেলে আরো লোক নিতে হবে। একা একা শেষ করা যাবে না। আল্লাহতালা আসলে মানুষকে বিপদে ফেলেন বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই।

আবদুর রউফের মুখে হাসি। বড় একটা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে সে যেতে পেরেছে এবং তা পেরেছে নিজের পরিশ্রমে, এই হাসি তারই।

কতো লাভ হবে? মনে মনে হিসেব করতে বসেন নাসিমা। কতো বেলা তাঁর কেটেছে না খেয়ে। কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না। এই দুর্দিনের অবসান তা হলে হতে চলেছে! আহা, যদি শফি আকবর এখন থাকতো পাশে। তাঁর চোখ ভিজে আসে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেন।

দেখি আবদুর রউফ, আমাদেরকে কি লিখতে হবে?

জ্বী, এই ছোট একটা কথা। বড় হরফে লিখতে হবে। ১৫´X১০´। *'আমরা সত্যিকার এবং আসল ইসলাম নিয়ে যাত্রা করছি। পূর্ণ ইসলামই হলো আমাদের আন্দোলন। প্রথমে রাসুলুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যে জামাত ছিল, আমরাও হুবহু সেই জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেছি'। -হযরত আবু আলা মওদুদী (রাঃ)।*

নাসিমা আকবর গম্ভীর হয়ে পড়েন। তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে যায়, মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। এই

মওদুদিয়া– বাণী তিনি লিখবেন তাঁর রঙ–তুলিতে? আসল ইসলাম মওদুদিবাদ? একি সম্ভব তাঁর দ্বারা?

তখনই তাঁর মনে পড়ে যায়, তীব্র তীক্ষ্ণ অভাবের কশাঘাত। ঘরে খাবার নেই। ধার হয়ে গেছে অনেক। তার ওপর নতুন জিজিয়া কর বাকি পড়ে গেছে। এ কাজটি না পেলে ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার। কি করবেন তিনি?

না, আবদুর রউফ, এ কাজ আমি করতে পারবো না। আমার হাতে এই অতি বড় মিথ্যা কথা আসবে না। আপনি এই কাজ ফিরিয়ে দিন।

আতিউর রহমান মিজানী খুবই ব্যস্ত। এই অতিবৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কাটাতে হচ্ছে ব্যস্ত দিন। সাম্প্রতিক ব্যস্ততার কারণ, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে মেহমান এসেছেন। রাষ্ট্রীয় মেহমান। কৃষ্ণলাল আভদানি। এই সফর একটি গোপন রাষ্ট্রীয় সফর। কৃষ্ণলাল আভদানির বয়সও তারই মতন। ইনি তাঁর পুরাতন দোস্ত। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রথম দেখা। মিজানী তখন গিয়েছিলেন হিন্দুস্তানে, হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে। সবচেয়ে বড় সাড়াটা পেয়েছিলেন কৃষ্ণলাল আভদানির কাছ থেকে। খুবই গোপন এক বৈঠক হয়েছিল দুজনের। আভদানি বলেছিলেন, ভাইরে, দেশের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা কার? বলেন দেখি।

আপনিই বলেন!

চোরের। চোর আছে বলেই চুরি হয়। সেজন্যেই পুলিশ আছে, পুলিশ আছে বলেই আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়। হা–হা–হা।

ভালো রসিকতা করেছেন, মহাশয়।

কিন্তু জনাব, কেন এই রসিকতা করলাম, বোঝা গেলো কি?

জ্বী না, বুঝলাম না।

আমাদের দেশে আপনারা হলেন চোর, আর আমরা পুলিশ, আর আপনাদের দেশে আমরা হলাম চোর, আপনারা পুলিশ। একজন আছে বলেই, আরেকজন আছে। মিজানী আছে বলেই আভদানির শনৈ শনৈ উন্নতি আর আভদানি আছে বলেই মিজানীদের জয়–জয়কার।

হা–হা–হা। তাই বলেন। এতো সহজ কথা।

তারপর দুজনে গভীর রাজনৈতিক আলোচনায় রত হয়েছিলেন। গোপন পরিকল্পনা। সেই থেকে আভদানি আর মিজানীর ঐক্যটা খাপের সঙ্গে তরবারির মতোই।

সেই পুরনো দোস্ত এখন তাঁরই মহলে। দুজনেই বুড়ো, প্রায় অক্ষম। আভদানি চলেন হুইল চেয়ারে।

তবু জোশ যায়নি তাঁর। গত রাতে তাঁর সম্মানে আয়োজন করতে হয়েছিল এক শাহী জলসার। কি যে কাণ্ড কারখানা সেখানে হয়েছে, তা মনে না করাই ভালো।

আজ সকালে বসছে তাঁদের রাজনৈতিক বৈঠক। তাঁর দরবারেই।

আভদানি আর মিজানীর একান্ত বৈঠক। দুজনের ব্যক্তিগত সচিব ছাড়া আর কেউই নেই সেখানে। মিজানীই প্রথমে মুখ খোলেন।

দোস্ত, বলেন, কি উপকারে আসতে পারি?

দোস্ত। সামনে ইলেকশন। লোকজন তো দিন দিন অধর্মা হয়ে পড়ছে। ভোটের ফল তো আমাদের পক্ষে আনা দরকার। এদিকে আপনাদের অবস্থাও তো ভালো মনে হচ্ছে না। লোকজনের

পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। এ অবস্থায় বিপ্লব তো টিকিয়ে রাখা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ, আসুন, নতুন ইস্যু তৈরি করি। সীমান্তে একটা ছোটখাট সংঘাত। সংঘাত ছোট কিন্তু আওয়াজ বড়। হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ। রীতিমতো জেহাদ।

আতিউর রহমান মিজানী এখনই কিছু বলেন না। কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তেমন ভালো নয়। তিনি প্রায় অবসর জীবন যাপন করছেন। তবে পরিকল্পনা খারাপ নয়। তাছাড়া কেন্দ্রকে বোঝানোর মতো নীতিগত রসদ তাঁর আছে। মওলানা আবু আলা মওদুদী বলে গেছেন,

'অমুসলমান দেশগুলোতে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাতে হবে। কিন্তু শক্তি লাভ মাত্র বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আক্রমণ চালাতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের প্রচার নিষেধ করা হবে এবং কাফেরদের মধ্যেও কাফেরদের প্রচার নিষেধ করা হবে'।

মনে হয়, প্রস্তাবটি ভালোই এবং কার্যকর করাও সম্ভব। এ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। বরং আপনাকে একটা সুখবর দিতে পারি। আমার মহলে অনেকগুলো কিশোরী বাঁদী এসেছে নতুন। আজ রাতটা তারা আপনার সেবা করে ধন্য হতে চায়।

আভদানির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে তিনি সতর্ক কূটনীতিক। রাজনৈতিক আলোচনা যেন প্রসঙ্গচ্যুত না হয় সেদিকে খুবই সজাগ।

পেয়ারে ইয়ার, দিন তারিখটা যতো তাড়াতাড়ি ঠিক করা যায়, ততোই মঙ্গল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই– তাঁকে আশ্বস্ত করেন মিজানী।

সকাল সকাল এ ব্যাপারে একটা অনানুষ্ঠানিক চুক্তি হয়ে যায়। এক সকালের ভেতরে হাজার রাত্রির অন্ধকার ঢেলে দেয়া হয় নীরবে।



অতল অনন্ত অসীম অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতরে নিমজ্জিত চরাচর। ঘন অন্ধকারের আবহটিকে আরো তমসাচ্ছন্ন করেছে পেঁচার ডাক, বাদুড়ের পাখার ঝাপটা, অচেনা-অশরীরী কণ্ঠের বিলাপ আর চিৎকার।

কয়েকজন বদরিয়া শিবির কর্মী হাঁটে এদিক-সেদিক, অন্ধকার ফুঁড়ে।

অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। অমানিশা তাদের নফসে আম্মারাকে উসকে দেয়।

অন্ধকারের ভেতরে তারা চালিয়ে যায় কথোপকথন।

একজন বলে, বেহেশতে তো প্রত্যেকের দুজন করে স্ত্রী থাকবে। মাত্র দুজন স্ত্রীতে কি চলবে?

বেশ চলবে হে, ভালোই চলবে। তারা এতো সুন্দর হবে যে, তাদের হাড় আর মাংসের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে পায়ের পেছন দিকের মজ্জা পর্যন্ত। তাদের কেউ যদি দুনিয়ার দিকে তাকাতো, তাহলে সারাটা দুনিয়া আলোয় আলোয় ভরে উঠতো। আর যদি কেউ একটু থুথু ফেলতো দুনিয়ায়, তাহলে সারাটা জাহান ভরে উঠতো সুগন্ধে।

শুধু তো দুজন স্ত্রী নয়, প্রত্যেকে পাবে কম পক্ষে ৮০ হাজার গোলাম আর ৭২জন হুর। প্রত্যেক বেহেশতবাসী পুরুষ হবে ত্রিশ বছরের যুবক। কোনো পুরুষ যখনই কোনো হুরের সঙ্গ পছন্দ করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার সঙ্গী করে দেয়া হবে।

আহা, বেহেশতে এতো সুখ। এতো আনন্দ। যখন ইচ্ছা তখনই নারী সঙ্গ! যাকে ইচ্ছে তাকে! বদরিয়া শিবিরের কর্মীদের শরীরে সঞ্চারিত হয় জোশ।

অথচ এই বিজনে তারা কেমন দিন কাটাচ্ছে নারীসঙ্গবর্জিত অবস্থায়।

ওই মহিলাতো একাই থাকে বাড়িতে, নাকি? একজন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

না, একা না, একজন বাঁদীও থাকে সঙ্গে। জবাব দেয় আরেক জন।

নাসিমা আকবরের কথা বলাবলি করে তারা। সকালে তারা গিয়েছিল নাসিমা আকবরের বাড়িতে, জামায়াতের ইজতিমায়ী নিযামের দাওয়াৎ দিতে। একা বাড়িতে কেবল দুজন জেনানা, বিষয়টি প্রত্যেকেরই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখন থেকেই।

রাত্রির অন্ধকার এখন ইবলিস ডেকে আনে তাদের রক্ত কণিকায়।

নাসিমা আকবর একা থাকে কেন? তার স্বামী নেই? একজন বদর কর্মীর জিজ্ঞাসা।

আছে, মিজানী মহলের কয়েদখানায়, আটক। শালা, হিন্দুস্তানের দালাল।

হিন্দুস্তানের দালাল মানে তো আমাদের দুশমন।

দুশমন জেহাদে পরাজিত হলে তাদের মাল-আওরাত-জেনানা তো গাজীদের জন্যে হালাল।

বদরিয়া শিবিরের এই কর্মী কজনের চোখ চিকচিক করে ওঠে, লালা ঝরে জিভ দিয়ে। তলপেট চিনচিন করে ওঠে; সঞ্চারণ আর বৃদ্ধি ঘটে প্রত্যন্ত প্রত্যঙ্গে।

ইবলিশ তাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে, রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায়, ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায়।

বদরিয়া শিবিরের সদস্য ছজন উপস্থিত হয় নাসিমা আকবরের বাড়ির দরজায়।

আবদুল হাফিজের বাড়ির দরজায় মধ্যরাতে জোরে ধাক্কার শব্দ।

হুজর, ও হুজুর, হুজুর ও হুজুর, দরজা খোলেন। নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার।

আবদুল হাফিজ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পাশেই তার স্ত্রী শাহিদা। দুজনের ঘুম ভেঙে যায় একই সঙ্গে। শাহিদা জড়িয়ে ধরেন স্বামীকে, ভয়ে, বিহ্বলতায়।

ও হুজুর, ও হুজুর, দরজা খোলেন।

কে? কে? বিছানা ছেড়ে ওঠেন আবদুল হাফিজ।

শাহিদা তাঁকে আটকে রাখেন। উঠবেন না, আপনার আল্লাহর কসম লাগে আপনি দরজা খুলবেন না। ভয় পাওয়া স্বরে অনুনয় করেন শাহিদা।

আবদুল হাফিজ উঠে পড়েন। বাতি জ্বালান। দরোজার কাছে যান।

কে, কে!

আমি ফতে। শফি আকবর ছাহেবের বাসায় কাম করি। আগে আপনাদের বাড়িতে কাম করতাম। দরজা খোলেন। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আবদুল হাফিজ দরজা খোলেন।

কি হয়েছে ফতে?

ও হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে। বদরিয়া শিবির বাড়িতে ঢুকছে গো। আম্মারে ধরছে গো। আমি পালায়া আইছি। ও হুজুর চলেন, আম্মা বুঝি মারা গেলো গো।

আবদুল হাফিজ চিন্তিত ও আর্ত বোধ করেন। এতোরাতে একাকি একটা বাড়িতে যাওয়া কি উচিত হবে, যেখানে অন্য কোনো পুরুষ থাকে না? বদরিয়া বাহিনী তো সেক্ষেত্রে তাকেই বেঁধে জেনার মামলায় ফাঁসাবে। এদিকে শাহিদা বেগমও চায় না, তিনি আর নাসিমা আকবরের কোনো বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন।

ও হুজুর, ও আম্মা, চলেন। এক্ষুণি চলেন। ফতে হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে হাত ধরে টানতে থাকে আবদুল হাফিজকে।

শাহিদা বেগমের ভেতরে তখন দুই বিপরীত চিন্তা। একদিকে একটি নির্যাতিত নারীকে উদ্ধারের আহ্বান, অন্যদিকে তার স্বামীকে অন্য কোনো নারীর কাছে নিয়ে যাবার ঈর্ষাবোধ। ঠিক তখনই তার মনে পড়ে নাফিজার মুখ। মিজানীর নিপীড়নে জর্জরিত তার কিশোরী কন্যা নাফিজা কেমন করে কাঁদছিল এই বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে।

চলেন, আমিও যাবো। বলেন শাহিদা বেগম।

আবদুল হাফিজের বাড়ি থেকে শফি আকবরের বাসা খুব বেশি দূরে নয়। প্রায় দৌড়ে তিনজন এসে পৌছেন শফি আকবরের বাড়িতে। ঘন অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।

কেবল আবদুল হাফিজের হাতে একখানা বাতি। সেই বাতি নিয়ে তাঁরা উপস্থিত হন শফি আকবরের দোরগোড়ায়।

বাইরে থেকেই চিৎকার করে ওঠেন আবদুল হাফিজ– খবরদার।

সেই চিৎকার এই অন্ধকার জনপদের এখানে সেখানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আলো আর মানুষের সাড়া পেয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসে ছজন বদরিয়া শিবির কর্মী। তারা এ এলাকা ছেড়ে চলে যায় তাড়াতাড়ি।

হাতের বাতির আলোয় আবদুল হাফিজ চিনতে পারেন তাদের।

ঘরের ভেতরে ঢোকেন তাঁরা।

যে দৃশ্য ভেসে ওঠে, তা দেখার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলেন আবদুল হাফিজ।

বিছানায় পড়ে আছেন নাসিমা আকবর। সম্পূর্ণ নগ্ন।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত বিছানা।

শাহিদা বেগম ছুটে যান তাঁর দিকে।

এখনো প্রাণ যায়নি। সংজ্ঞা হারিয়েছেন নাসিমা।

নাসিমাকে এক ভোরে মসজিদের পাশ থেকে উদ্ধার করেছিল এই পরিবারই, আজো এই পরিবার তাঁর শুশ্রূশায় নিয়োজিত হয়।

মিজানী মহলের দরবার কক্ষ। আরজি নিয়ে এসেছে আবদুল হাফিজ। আতিউর রহমান মিজানীর কাছে তাঁর আরজি, তাঁর ফরিয়াদ।

বদরিয়া শিবিরের ছজন কর্মী ধর্ষণ করেছে একজন গৃহবধূকে। তিনি নিজ চোখে দেখেছেন।

কে সেই গৃহবধূ? তাকিয়ায় আধশোয়া আতিউর রহমান মিজানী অর্ধনির্মীলিত চোখে অর্ধভঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

নাসিমা আকবর।

স্বামীর নাম?

শফি আকবর।

শয়তানী হাসি দেখা দেয় আতিউর রহমান মিজানীর রেখা–জর্জরিত মুখে।

আবার সেই নাসিমা আকবর। জনাব আবদুল হাফিজ, আপনি নাসিমার বিষয়ে এতো উৎসাহী কেন বলুন তো।

আবদুল হাফিজের মাথায় রক্ত উঠে আসে, রাগে হাত পা কাঁপতে থাকে। তবু তিনি যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলেন, নাসিমার বিষয়ে আমার আলাদা কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু বদরিয়া শিবিরের সদস্যরা যদি চরিত্র বিসর্জন দেয়, তবে তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনার শেষ নেই।

চরিত্র বিসর্জন? মনে মনে হাসেন মিজানী। বিসর্জন নয়, চরিত্র অনুযায়ী আচার, ভাবেন তিনি।

আতিউর রহমান মিজানীর মাথায় রাজনৈতিক কূটনীতি খেলা করে ওঠে। বদরিয়া শিবিরের ছজন কর্মীর নাম ধাম সব পেশ করেছে আদুল হাফিজ। বিচারে বসলে তিনজন মুসলমান সাক্ষীও হয়তো জোগাড় করে আনবেন আবদুল হাফিজ। সে ক্ষেত্রে ছজন বদরের ছঙ্গেছার করতে হবে। অর্ধেক মাটিতে পুঁতে ঢিল ছুড়ে মারতে হবে এদের। এটা করা ঠিক হবে না। তাহলে বদরিয়া শিবিরের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে। কেউ শুনতে চাইবে না তাঁর নির্দেশ। এমনিতেই বার্ধক্যপীড়িত তাঁর আদেশ কেউ শুনতে চায় না।

এটা হতে দেয়া যায় না। তাছাড়া আবদুল হাফিজ ইদানীং দল পাকাচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। মাঝে মধ্যে সমমনাদের নিয়ে সে যে জামাতিয়া মওদুদিয়াবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে তার খবরও তিনি পেয়েছেন। এই লোককে বাড়তে দেয়া ঠিক নয় মোটেই। আতিউর রহমান মিজানী তাঁর কর্মপন্থা মনে মনে ঠিক করে ফেলেন।

শোনেন আবদুল হাফিজ, নাসিমা আকবর হিন্দুস্তানের এক দালালের স্ত্রী। নারী হয়ে সে নিজেও নানা ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত যা আমাদের বিধি ও হযরত আবু আলা মওদুদীর বিধান অনুসারে ঠিক নয়। এমন একটা মহিলা আসলে মালে গনিমত ছাড়া কিছুই নয়। মালে গনিমতের সঙ্গে মিলিত হওয়া মওদুদী বিধান অনুসারে অন্যায় কিছু নয়।

আবদুল হাফিজের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আপনি এসব কি বলছেন?

মিজানী ওয়াজের সুরে বলেন, হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে আমরা রাছুলুল্লাহের (দঃ) সাথে বনি মুস্তালিক যুদ্ধে বাহির হইলাম এবং তথায় আমরা বহু যুদ্ধবন্দী লাভ করিলাম। এ–সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জাগিল এবং নারীবিহীন থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা (যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে) আজল করাকেই পছন্দ করিলাম,...আমরা তাঁহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : (আজল) না করিলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।

আবদুল হাফিজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, যুক্তি খোঁজেন। বলেন, এটা ইসলামের প্রথম দিকের একটি ঘটনা। তখন জেহাদে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হয়ে থাকবে। সে সময়ের আরব দেশের জন্যে এ রীতি হয়তো তেমন বেমানান ছিল না। তখনতো কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার কোনো মিল নেই। কারণ বদরিয়া শিবির আমাদের জামাতের বেতনভুক্ত কর্মচারী। তারা কেন মালেগনিমতের ওপর ভাগ বসাবে? আর এখন তো জেহাদ চলছে না।

আতিউর রহমান মিজানী বিরক্তি বোধ করেন। ১৪০০ বছর আগের আরবের আচার এখনকার সময়ে প্রাসঙ্গিক যদি না হয়, তবে তো জামাতিয়া মওদুদিয়ার জেহাদের ইতিহাসই মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর মনে পড়ে ১৯৭১ সালের গণ্ডগোলের কথা। সে সময় তাঁরা ফতোয়া দিয়েছিলেন– বাঙালি নারীরা, হিন্দুস্তানের দালালদের স্ত্রী কন্যারা, হিন্দু নারীরা সব গনিমতের মাল। পাকসৈন্য আর বদর শামসের জন্যে তারা ভোগ্য। সেই ফতোয়া ধরেই চলে গণধর্ষণ। কাফের–কমিউনিস্ট–বেদ্বীন নারীদের ওপরে সেবার একটা বড় শোধই নেয়া গিয়েছিল।

অতঃপর মিজানী যুক্তি খুঁজে পান। তিনি বলেন, এখন জেহাদ চলছে না, এ কথা ঠিক নয়। এখনো জেহাদ চলছে। মাওলানা আবু আলা মওদুদী বলে গেছেন, ইসলামে নামাজ রোজা বড় কথা নয়, বড় কথা জেহাদ। তাঁর ভাষায়, 'নামাজ, রোযা, যাকাত, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ প্রস্তুতি ও শিক্ষার জন্যে, যে রূপ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র তাদের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অসামরিক চাকরিরত লোককে প্রথমত বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে পরে তাদের কাছ থেকে কাজ নেয়। ইসলামও সেরূপভাবে যে সমস্ত লোক মুসলমানত্বের চাকরিতে ভর্তি হয়, তাদেরকে প্রথমত বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দেয়, তারপর তাদের দ্বারা জ্বিহাদ ও হুকুমতে ইলাহীর সেবা নিতে চায়।' এই বাণী আপনি পাবেন 'হকিকতে জ্বিহাদ' গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায়।

কাজেই, আবদুল হাফিজকে লক্ষ্য করে মিজানী বলেন, এ সব জেনার কাল্পনিক অভিযোগ নিয়ে আসবেন না। অপরাধ প্রমাণ করতে পারবেন না। বরং নাসিমা আকবরের প্রতি এশকবশত তাকে আপনি গভীর রাতে তুলে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে–এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করুন। প্রমাণ করা যাবে।

আবদুল হাফিজের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। ন্যায়বিচার পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই এই আতিউর রহমান মিজানীদের দরবারে। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, ধাতস্থ হন। তারপর মিজানীমহল ত্যাগ করেন। তাঁর চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি হাদীস শরীফ থেকে পাঠ করেন, 'আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহ আর রাসুলের ধর্মের ওপর দৃঢ়পদ থেকে অগ্রসর হও। অতিবৃদ্ধ, ছোট ছোট বালক–বালিকা এবং স্ত্রী লোকদিগকে হত্যা করো না। বিশ্বাসঘাতকতা করো না। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করো। উপকার কর ও দয়া প্রদর্শন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ উপকারীকে ভালোবাসেন'।

তার মানে তখনকার যোদ্ধারা শিশু এবং নারীদেরও হত্যা করতো। রাসুল (দঃ) তাদের বাঁচাতে

চেয়েছেন। দয়া দেখাতে বলেছেন। উপকার করতে বলেছেন। কোন হাদীসের কোন ব্যাখ্যা কে জানে? একেকজনের কাছে এর ব্যাখ্যা একেক রকম। সুফী সাধকের কাছে সবকিছু প্রেমময়, ভণ্ড রাজনীতিকের কাছে সব প্রতিহিংসামূলক।

যারা রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করে, তাদের হাতে ধর্ম সবচেয়ে বিপন্ন, সবচেয়ে বিপজ্জনক। হে আল্লাহ, এই মসিবতের হাত থেকে এই দেশকে রক্ষা করো। এই জামাতিয়া মওদুদিয়ার হাত থেকে তোমার দ্বীনকে রক্ষা করো।



মাথা থেকে পাহাড় নেমে গেলে কেমন লাগে কে জানে? যখন মালেকুল মউত জান কবচ করবেন, তখন শরীরের ওপরে পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়, একথা আবদুল হাফিজ শুনেছেন, তবে পাহাড়ের ভার থেকে মুক্ত হলে কেমন লাগে? আবদুল হাফিজের আজ তেমনি লাগছে। নির্ভার। গ্লানিমুক্ত। যেন শিমুল বীজ, তুলায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়াবেন আকাশময়। বাসায় এসেছেন এক হাড়ি মিষ্টি সমেত। নবীজীর সুন্নত মিষ্টি খাওয়া, তার নিজেরও খুবই পছন্দের খাদ্য। বাড়ির দরজায় পা দেবার আগেই সাতচিৎকার– শাহিদা, শাহিদা। শাহিদা বেগম তখন হাম্মামখানায়। পরিচারিকা ছুটে আসে তার কাছে। 'আম্মায় তো গোসলখানায়'। তিনি ছুটে যান হাম্মানখানার দরজায়। শাহিদা, শাহিদা, দরজা খোলো।

কেন, কি হয়েছে? বিষয় বুঝতে না পেরে উৎকণ্ঠিত স্বরে জানতে চান নাফিজার আম্মা। দরজা খোলোই না। দেখ কি এনেছি?

একটুক্ষণ সবুর করুন। এখন খোলা যাবে না।

না, এক্ষুণি খোলো। না হলে দরজা ভেঙে ফেলবো কিন্তু।

শাহিদা বেগম দরজা সামান্য ফাঁক করেন। ব্যাপারটা কি বুঝতে চেষ্টা করেন।

ফোঁকরে হাত ঢুকিয়ে দেন আবদুল হাফিজ। কড়াটা টেনে খুলে ফেলেন।

নাও, মিষ্টি খাও। এক নম্বর মিষ্টি। নবীজানের সুন্নত।

দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়া গুনাহ।

তাহলে বসে খাও।

একহাতে মিষ্টি তাঁর, অন্য হাতে শাহিদা বেগমের গলা জড়িয়ে ধরেন আবদুল হাফিজ। স্ত্রীকে বসিয়ে দিতে চান। অর্ধবসনা শাহিদার সমস্ত শরীর ভেজা। ভেজা চুল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে টুপটুপ করে।

মিষ্টি নয়, একটা গভীর আনন্দিত চুম্বন হাফিজ পুরে দেন স্ত্রীর দুই ঠোঁটে।

শাহিদা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নেন নিজেকে। দরজা খোলা। ঘরে পরিচারিকারা রয়েছে। আর বয়স তো কম হলো না। এ বয়সে এসব কি হচ্ছে?কি হয়েছে সেটা আগে বলবেন তো? কি হয়েছে?

কি হয়নি বলো? ইস্তফা দিয়ে এলাম। একেবারে লিখিত ইস্তফা। আমি মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ পিতা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান জামায়াতে মওদুদিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এই ইস্তফাপত্র সজ্ঞানে নিজহস্তে লিখিয়া দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর প্রতি শোকরানা প্রকাশ করেন শাহিদা। হাম্মামখানা থেকে বেরিয়ে আসেন আবদুল হাফিজ। তাঁর মুখে হাসি। তাঁদের পরিচারিকাটি এগিয়ে আসে। খালুজানের মুখে বহুদিন হাসি দেখেনি সে। আজ তিনি হাসছেন। সাহস করে সে বলে, কি হইছে খালুজান, কোনো খুশির খবর?

আগে মিষ্টি খা।

খালুজান আমি মিষ্টি খাই না। বমি বমি লাগে।

খবরদার। বাজে বকবি না। মিষ্টি খাওয়া সুন্নত। জামাতিয়া মওদুদিয়া ছেড়ে দিয়েছি বলে কি রাসুলুল্লাহ (দঃ)–এর ইসলাম ছেড়ে দিয়েছি নাকি? আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে সঁপে দেবো বলেই তো ইস্তফা দিয়ে এলাম।

পরিচারিকাটি কি বোঝে, সেই জানে। তাইলে তো মিষ্টি খাইতেই হয় – বলে সে একটা মিষ্টি মুখে পুরে হাসতে থাকে।

উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলে নানা ভাবনা উঁকি দেয় আবদুল হাফিজের মস্তিষ্কে। এখন কেবল শির্ভার পাখির মতো ডানা মেলে বেড়াবার সময় নয়। প্রথম সমস্যা বেকারত্ব। জামায়াতে মওদুদিয়ার সদস্যপদ হারানোর অর্থ মসজিদের খাদেমের চাকরিটি খোয়ানো। তাঁকে একটা কাজ খুঁজে বের করতে হবে। এ এমন এক সময় যখন জামাতিয়ার সদস্য না হলে মসজিদে চাকরি পাওয়া যায় না। এটা যে কেবল ইদানীংকালে হচ্ছে তাই নয়, অনেক বছর আগে যখন দেশে জামাতিয়া শাসন ছিল না, তখনো এমনটা হতো। দেশের প্রধান মসজিদের খতিব ছিলেন একজন জামাতিয়া। তখন অবশ্য আবদুল হাফিজ নিতান্ত বালক। পড়তেন মাদ্রাসায়। ছাত্রাবস্থাতেই দাওয়াৎ পান মওদুদিয়া শিবিরের। হুজুগে তিনিও ঢুকে পড়েন। প্রথম প্রথম কাজ করতেন আল্লাহ্‌র ভয়ে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, কোরআন হাদীস নিয়ে আলোচনা করা– এসব তিনি করতেন আল্লাহ্ ভক্তি থেকে। পরে তাঁদেরকে যুক্ত করা হয় রাজনীতির সঙ্গে। তবে তিনি কখনোই মারামারি কাটাকাটিতে যেতেন না। ছেলেবেলায় একবার তার টাইফয়েড হয়েছিল। দেড়মাস পড়েছিলেন বিছানায়। টাইফয়েড হলো ভূতের মতো, যাবার সময় কিছু না কিছু নিয়ে যায়। আবদুল হাফিজের নিয়ে গিয়েছিল চুল। টাইফয়েডের পর থেকেই তাঁর মাথায় টাক। ছাত্ররা তাঁকে খেপাতো টেকো হাফিজ বলে। আবদুল হাফিজ তখনি ঠিক করেন হাফিজ–ই– কোরান হবেন। তাহলে তো ছেলেরা তাঁকে টেকো বলে খেপাতে পারবে না। কোরআন শরীফ নিয়ে তো আর কেউ রসিকতা করতে পারবে না। যাই হোক, টাইফয়েডের পর তাঁর শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি আর মওদুদিয়া শিবিরের শারীরিক রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেননি। কোরআন শরীফে হাফেজ হয়ে নিজের পিতৃদত্ত নামটিকে সার্থক করার পেছনেই সময় ব্যয় করেন বেশি। মওলানা আবুল আলা মওদুদীর বইপত্র বিশেষ পড়া হয়ে ওঠেনি তাঁর।

রাজনীতির খবর খুব একটা রাখতেন না, আসলে প্যাঁচ–ঘোচ বুঝতেন না, এসব তাঁর মাথায় ঢুকতো না। একবার এক কর্মী সম্মেলনে বলা হয় আর দশ বছরের মাথায় ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার টার্গেট ধার্য করা হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে যান। একজন সিনিয়র নেতাকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, দশ বছরের মধ্যে বিপ্লব হবে কি করে? এখনো তো পার্লামেন্টে আসন মাত্র ১০–১২ ভাগ। সারা দেশে আমাদের প্রাপ্ত ভোটের হারও তো এ রকমই। দশ বছরে কি জনসমর্থন এতোটা বাড়ানো যাবে?

নেতাটি হেসে ফেলেন। আবদুল হাফিজ, তুমি এখনো টেকো হাফিজই রয়ে গেলে। বিপ্লব করতে গেলে ভোট লাগে না। আর যারা ভোট পায়, তাদের বিপ্লব লাগে না। আমাদের পরিকল্পনাটা খুবই সোজা, খুবই সরল। আমরা আমাদের লোকদের বেশি বেশি করে ঢোকাচ্ছি সেনাবাহিনীতে, প্রশাসনে, পুলিশে সর্বত্র বুনিয়াদী পদগুলোয়। আজ থেকে দশ বছরের মাথায় এরাই হবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্তা। ওই সময় দেশজুড়ে যদি নৈরাজ্য সৃষ্টি করা যায়, ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যর্থতা প্রকট করে তোলা যায় – তাহলেই হলো। বিপ্লব আপনা–আপনিই সংঘটিত হবে।

কিন্তু সেটা কি উচিত হবে? বেশির ভাগ মানুষ যদি না চায়?

কেন হবে না? হযরত মুহম্মদ (দঃ) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তিনি কি একা ছিলেন না?

ওই যুক্তি আবদুল হাফিজের ভালো লেগেছিল। তখন বয়স ছিল অল্প, বুদ্ধি ছিল কম, আবেগ ছিল বেশি। কিন্তু আজ যখন তিনি প্রশ্ন করা শিখেছেন, তখন জানেন, ওই যুক্তি কতো হাস্যকর আর জোলো। হযরত মুহম্মদ (দঃ) আর জামায়াতে মওদুদিয়া এক নয়; জামায়াত তো আর নবয়ুত কিংবা রিসালাত প্রাপ্ত হয়নি।

দুপুরে আবদুল হাফিজ সস্ত্রীক খাওয়া-দাওয়া সারেন। খাওয়ার পর যেতে হবে মসজিদে, জোহরের নামাজ আদায় করতে। কে জানে, আজ মসজিদে নামাজ আদায় করতে দেয়া হবে কিনা? খেতে খেতে এসব নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের। দুজনে ঠিক করেন, আছরের নামাজের পর যাবেন শফি আকবরের বাড়িতে। মাত্র গতকাল নাসিমা আকবরকে তাঁর বাসায় রেখে আসা হয়েছে। সে রাতের ঘটনার পর তিনি এখানেই ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ফেরে পুরো ২৮ ঘন্টা পর। চৈতন্য ফিরে পেয়ে তিনি খুব বেশি রকম শান্ত ছিলেন। চোখ খুলে চার দিকে তাকিয়ে বলেন, জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছে। শাহিদা আপার বাড়ি।

শাহিদা বেগম পাশেই ছিলেন।

আলহামদু লিল্লাহ। আপা চুপ করে থাকেন, বেশি কথা বলার দরকার নেই।

শাহিদা বেগমের হাত নিজের হাতে টেনে নেন নাসিমা আকবর। আপনার কাছে আমার ঋণ প্রতিদিন বাড়ছে। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যেই আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন, আপা।

গতকাল নিজের বাসায় গেছেন শাহিদা। তাঁর এক কথা, যা হবার তাতো হয়েই গেছে, আমি নিজের ঘরেই থাকতে পারবো, কোনো অসুবিধা হবে না। স্বামী ছিল, তাকে ওরা নিয়ে গেছে। আর নিজের যা ছিল, তাও তো নেই। আমার আর হারানোর কি আছে?

তাঁর কথা শুনে শাহিদার দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসে, কিন্তু এক ফোঁটা পানি ফেলেননি নাসিমা আকবর।

আছরের নামাজ শেষে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরেন আবদুল হাফিজ। মসজিদে কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। তিনিও আগ বাড়িয়ে কাউকে কিছু বলেননি। শাহিদা বেগম তৈরি হয়েই ছিলেন। একটা বোরখা শরীরে চাপিয়ে শাহিদা বলেন, একটু দাঁড়ান। পিঠা তৈরি করছি। সিদ্ধ পিঠা। আরেকটু হলেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। গরম গরম আপনাকে দুটা দিই, আপনি খান। নাসিমা আপার জন্যেও নিয়ে যাই। টিফিন কেরিয়ার রেডি করেই রেখেছি। দুই দণ্ড মাত্র। একটু বসেন।

আবদুল হাফিজ বসেন। আছরের নামাজের পরে মাগরিব একটু তাড়াতাড়ি আসে। এই যা তাড়া! অন্য কোনো তাড়া নেই। আজ তিনি ভারমুক্ত। জঞ্জালমুক্ত। আজ তাঁর মুক্তির দিন। দুদণ্ড নয়, দুপ্রহর বসতেও তাঁর আপত্তি নেই।

দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। কে এলো অসময়ে? আবদুল হাফিজ ওঠেন। দরজা খোলেন। আচ্ছালামু আলাইকুম। বদরিয়া বাহিনীর ছজন সদস্য।

ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি ব্যাপার? আপনারা?

আপনাকে একটু আসতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বুক কেঁপে ওঠে আদুল হাফিজের।

কোথায়?

মিজানীমহলে?

মিজানী ছাহেব ডেকেছেন?

না।

তাহলে? এ অসময়ে? কোথায়?

কয়েদখানায়। আপনাকে আটক করার সমন জারি করা হয়েছে।

কে করেছেন?

হযরত আতিউর রহমান মিজানী।

আমি কি ভেতর থেকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি?

না, পারেন না।

আচ্ছা, চলুন।

চুলার ওপরে হাড়ি। পানি ফুটছে। একটা পিঠা চামচে করে নামান শাহিদা। মিষ্টি কেমন হয়েছে চাখা দরকার। প্রথম পিঠা পুরুষ মানুষের মুখে দেওয়া উচিত। তিনি একটা বাটিতে পিঠাটা রেখে ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢোকেন।

আবদুল হাফিজ নেই।

দরজা খোলা।

গরম পিঠা থেকে ভাপ ওঠে।

যেতে যেতে আবদুল হাফিজ বলেন, আমি দীর্ঘদিন আপনাদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করেছি, আজ আপনাদের হাতে আমি বন্দী হয়েছি। আমি আপনাদের কাছে কোনো সুবিধা চাই না। কেবল একটা অনুরোধ আমি করবো। মিজানীমহলের কয়েদখানায় নেবার আগে আমি একটু মিজানী ছাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর খাস কামরার সামনে আপনারা আমাকে একটু নেবেন। তিনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন, তাহলে তো আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই, কি বলেন?

আমরা কিছুই বলি না। বদরিয়া বাহিনীর দলটির অধিনায়ক বলেন।

আবদুল হাফিজের এই আর্জিটি মঞ্জুর হয়। মিজানীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। একটু পরেই হবে মাগরিবের আজান। মিজানীর হাতে সময় কম।

কি বলতে চান আবদুল হাফিজ, সময় কম, তাড়াতাড়ি বলেন। অর্ধশায়িত মিজানী অর্ধভঙ্গস্বরে বলেন।

আমি কি জানতে পারি, আমাকে ধরা হলো কেন?

জ্বী পারেন। বলে দিচ্ছি। অবশ্য এটা আপনার না জানা থাকবার কথা নয়। মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মেঁ গ্রন্থের ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় মওলানা আবু আলা মওদুদী ছাহেব আপনার সওয়ালের জবাব লিখে গেছেন। আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। হাতড়ে হাতড়ে একটা বই বের করেন মিজানী। কুতকুতে চোখে পড়েন –'যারা বহুরূপী এবং মত পরিবর্তনকে ক্রীড়া বিশেষে পরিণত করেছে, আমরা তাদের জন্য জামায়াতে প্রবেশদ্বার বন্ধ করতে চাই। ... সুতরাং, এ প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা যে, এ জামায়াতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগেই জানানো হয় যে, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, এই হচ্ছে ইসলামে ধর্ম ত্যাগীর শাস্তি।' আর আপনি তো জানেনই আমরাই হচ্ছি খাঁটি ইসলামী, জামায়াতের সদস্য হয়ে তা ত্যাগ করার মানেই মুরতাদ হয়ে যাওয়া। মুরতাদের শাস্তির বিধান আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত্যু।

আল্লাহু আকবর। আজান হয়। মিজানী নামাজের তাগিদ অনুভব করেন। আপনি এখন যান।

বদরিয়ারা এসে আবদুল হাফিজকে টানতে থাকে। তাঁর কোমরে দড়ি। সামনে এবং পেছনে অন্ধকার।



সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে সবে। তবুও গাঢ় অন্ধকার। আকাশে ঘন মেঘ। গুমোট হয়ে আছে চারদিক। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

ছয়জন বদরিয়া কর্মী বেরিয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত সান্ধ্য-টহলে।

কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আছে উত্তেজনায়। মিজানী মহল থেকে বেরিয়েছে তারা লক্ষ্যহীনভাবে, কিন্তু সকলের পা চলতে শুরু করেছে এক নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

কেউ কোনো কথা উচ্চারণ করে না বটে; কিন্তু তারা জানে, তারা চলেছে আবদুল হাফিজের বাড়ির উদ্দেশে।

তাদের চোখ-মুখ-কানে উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস ভারি, তলপেটে শিহরণ। আবদুল হাফিজকে গত সন্ধ্যায় তারা ধরে নিয়ে গেছে কয়েদখানায়; জামাতিয়া মওদুদিয়া ত্যাগ করার অপরাধে; যে অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড। মুরতাদ হয়ে গেছে আবদুল হাফিজ।

তার সোমত্ত স্ত্রী, যার বয়স কতো হবে কে জানে, দেখায় তিরিশের মতো, এখন একা একটি বাড়িতে। আর আছে যুবতী বাঁদীরা। শত্রুপক্ষের সম্পত্তি আর স্ত্রী-দাসীরা, জামাতিয়া মওদুদিয়ার আইন অনুসারে, মালে গণিমত। তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে পূর্বানুমতির দরকার হয় না, দরকার হয় না আজল করারও। এই তো কিছুদিন আগে শফি আকবরের স্ত্রীর ওপরে চড়াও হয়েছিল তারা। মিজানী তাদেরকে এ নিয়ে সামান্য কটু-কাটব্যও করেননি।

বদরিয়াদের পা-ফেলা দ্রুততর হতে থাকে। আর একটি মাত্র মোড় পেরুলেই আবদুল হাফিজের বাড়ি দেখা যাবে। মিনিট দশেকের পথ। ঘুঁটঘুটে অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না। নীরবতা ভেঙে একটি মানবশিশুর কান্না ভেসে আসে। কে কাঁদে? হয়তো কোনো শকুন-ছানা, হয়তো কোনো মনুষ্যসন্তান, নয়তো কোনো জ্বীন। রিরংসা-তাড়িত ছয় বদরিয়া দৌড়ুতে শুরু করে।

আবদুল হাফিজের স্ত্রী শাহিদা বেগম দু'বার সংজ্ঞা হারিয়েছেন গতরাত থেকে। পরিচারিকারা পানি ঢেলেছে তাঁর মাথায়। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি জানতে চেয়েছেন, উনি ফিরেছেন?

সন্ধ্যা তার কালো বোরখা দিয়ে যখন আজকের দিবসটিকে ঢেকে দিয়েছে, তখন স্বামীর কুশল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে দেখা দিয়েছে নতুন আশঙ্কা; তাঁর নিজের কি হবে? নারী-সংসর্গ-বঞ্চিত বদরিয়া বাহিনীর রক্ত-লালসা থেকে তিনি নিজে বাঁচবেন কি করে? তাঁর বারবার মনে পড়ে নাসিমা আকবরের মুখ। অশ্রু গড়াতে থাকে তাঁর দু' চোখ বেয়ে, ভয়ে আশঙ্কায় মুখ শুকিয়ে হয় আধখানা।

না, বিনা প্রতিবাদে তিনি নিজেকে তুলে দেবেন না বদরিয়াদের নখ–দাঁত–ঠোঁটের নিচে, তিনি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাধা দেবেন তাদের। নিজে মরবেন, তবে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বদরিয়াদের। প্রতিজ্ঞায়–সংকল্পে চোয়াল দৃঢ় হয়ে ওঠে তাঁর। ঘরে কেরোসিন আছে দুই টিন, তাঁর মনে পড়ে। তিনি তাঁর বাইরের ঘরটির দরজা দুটো ভিজিয়ে দেন কেরোসিন তেলে। কাঠের ঘর। ঘরের দেয়ালের এখানে সেখানেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন কেরোসিন। একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স মজুত রাখেন হাতের কাছে।

পরিচারিকাদের ডেকে বলেন, বদরিয়া বাহিনীর লোকেরা এলে তোমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবে। দুনিয়া অনেক বড়, কোথাও না কোথাও তোমাদের আশ্রয় জুটবে। দেরি করবে না। এ ঘরে আমি একা থাকবো।

বাইরের ঘরে বসে একা মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেন শাহিদা বেগম। খট করে শব্দ হয়। তিনি দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা হাতের মুঠোয় নেন। না, একটা বিড়াল পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত হন, তবু তাঁর বুক কাঁপা থামে না।

চারদিক নিঝুম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ। একাধিক ব্যক্তির চলাচলের শব্দ। শাহিদা বেগম চারদিক দেখে নেন। কেরোসিন তেলে ভিজে আছে দরজা দুটোর কবাট। ঘরের অন্যত্র কেরোসিন ছিটানো। তাঁকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। স্থির–মস্তিষ্কে তিনি আপ্যায়ন করবেন বদরিয়াদের। ঘরে এনে বসাবেন। দরজা বন্ধ করবেন। তারপর...।

ঠক ঠক ঠক। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ধীর পায়ে উঠে যান শাহিদা। মুখে হাসি আনার চেষ্টা করেন। সেটা মুখকে বিকৃত করে কেবল। দিয়াশলাই হাতে ধরা। তিনি দরজা খোলেন।

দুজন লোক ঢুকে পড়ে ঘরে। ভাবী, আমাদেরকে আপনার মনে আছে? আমার নাম আবদুল কাইয়ুম আর এনার নাম আসাদ বিন হাফিজ। কবি আসাদ। সেই যে মাসখানেক আগে আপনার বাসায় দাওয়াৎ খেলাম।

ফিসফিস করে দ্রুতগতিতে বলে চলে আবদুল কাইয়ুম।

শাহিদা বেগম এঁদের চিনতে পারেন। আবদুল হাফিজের বন্ধু। জামাতিয়া মওদুদিয়ার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, এঁরা তাদের দলে। আবদুল হাফিজ প্রায়ই যোগাযোগ করতেন এঁদের সঙ্গে। গতমাসে এঁদেরকে ডেকে খাইয়েছিলেনও বাড়িতে।

জ্বী, চিনতে পারছি।

ভাবী, সময় খুব কম, আবদুল হাফিজকে ধরে নিয়ে গেছে মিজানীমহলের কয়েদখানায়। তার কপালে কি আছে, আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু আপনাকে আমরা তুলে দিতে চাই না বদরিয়া–বদমাসদের হাতে। আমরা এ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনিও চলেন।

আপনারা যাচ্ছেন কেন?

কারণ, আবদুল হাফিজের সঙ্গে যে আমাদের যোগাযোগ ছিল, মিজানী সেটা জানেন। ওরা আমাদের খুঁজতে শুরু করেছে। দেরি করবেন না।

মুহূর্তখানেক ভাবেন শাহিদা। তারপর বলেন, চলেন। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। যাবার আগে পরিচারিকাদের তিনি নির্দেশ দেন এই গৃহ ত্যাগ করতে, অন্য কোনো বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিতে।

রাত্রির অন্ধকারে যখন তাঁরা মিশে যান, তখনই পুনর্বার কড়া নড়ে ওঠে আবদুল হাফিজের সম্মুখ–দ্বারে। ছয়জন বদরিয়া কর্মী এসে হাজির হয়েছে সেখানে।



আবদুল হাফিজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মৃত্যুর আগে তার কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করে কিনা। আবদুল হাফিজ বলেছিলেন, করে। সিদ্ধ পিঠা খেতে ইচ্ছা করে।

আজ সকালবেলায় খেতে দেয়া হয়েছে সিদ্ধ পিঠা। গরম গরম।

শফি আকবর আর আবদুল হাফিজ দুজনেই খেতে বসেছেন সেই পিঠা। খুবই গরম। ভাপ উঠছে।

শফি আকবরের কপালটাই এরকম কিনা কে জানে, সব মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ঠাঁই পায় তার সহকারাবাসীরূপে। এর আগে গিয়েছেন রফিকুল হক। এবার যাচ্ছেন আবদুল হাফিজ।

আবদুল হাফিজের সঙ্গে পরিচয়ের সন্ধ্যাটি মনে পড়ে শফি আকবরের।

এক মৌলভীধরনের লোককে বদরিয়ারা রেখে যায় তার কারাকক্ষে।

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তিনি এই আগমনটা সম্পন্ন করেন। এগিয়ে আসেন শফি আকবরের দিকে।

আচ্ছালামু আলায়কুম। শফি আকবর সাহেব, কেমন আছেন?

ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।

অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে শফি আকবরের অন্তর। কে জানে, এটা আবার জামাতিয়াদের নতুন কোনো ফন্দি কিনা! সহবন্দীবেশে ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা কিনা!

আলহামদুলিল্লাহ। ভালো থাকলে আল্লাহর শোকর করুন। জ্বী, আমার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি। আমার নাম আবদুল হাফিজ। আমি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার স্ত্রী নাসিমা আকবর আমার বিশেষভাবে পরিচিত।

কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

না, আপনি চেনেন না। এসবই ঘটেছে আপনাকে আটক করবার পর।

আবদুল হাফিজ তাঁকে বিশদভাবে বলেন সেই সব ঘটনা–কেমন করে নাসিমাকে তিনি পড়ে থাকতে দেখেন মসজিদের দাওয়ায়, কেমন করে তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে, শফি আকবরের মুক্তির ব্যাপারে কি কি চেষ্টা করেছেন তিনি, আর আজ কেনই বা আটক তিনি নিজেই।

সব শুনে শফি আকবরের বড় আপন মনে হয় আবদুল হাফিজকে। আবেগের আতিশয্যে তিনি জড়িয়ে ধরেন হাফিজকে, তাঁর দুচোখ বেয়ে দরদর করে ঝরতে থাকে জল। তিনি জানতে চান কেমন আছে নাসিমা। যে আবদুল হাফিজ জীবনে একটি কথাও বলেননি মিথ্যা, আজ মিথ্যা বলেন তিনি, বলেন, নাসিমা ভালো আছে, তাঁদের ব্যবসা ভালো চলছে।

এই মিথ্যাটুকু ধরতে পারেন না শফি আকবর।

পিঠাটা খুব ভালো হয়েছে, কি বলেন? তবে মিষ্টিটা একটু কম হয়েছে, এই আর কি।

খেতে খেতে বলেন আবদুল হাফিজ।

খুব যত্ন করে পিঠা হাতে তুলছেন তিনি। অতি গরম। ফুঁ দেন আবদুল হাফিজ।

শফি আকবর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। তার নিজের আর পিঠা খাওয়া হয় না।

বেশ কয়েকটা পিঠা খান আবদুল হাফিজ। পরিতৃপ্তির সঙ্গে। খাওয়া শেষে পানি দিয়ে থালা ধুয়ে সেই পানিটুকুও খেয়ে নেন। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

গোসলটা সেরে আসি। তার আগে দাঁত মাজা দরকার। মিসওয়াকটা আবার আল্লাহ্‌র নবীর খুব প্রিয় কাজ ছিল। প্রতিবার গোসলের আগে তিনি মিসওয়াক করতেন। একটা দাঁতন হাতে নিয়ে বলেন তিনি। গোসল সেরে পরিষ্কার কাপড় পরেন। দু'চোখে সুরমা লাগান। গায়ে আতর মাখেন। এসবই তাঁকে সরবরাহ করা হয়েছে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী। সাবেক জামাতিয়া হওয়ায় কয়েদখানার রক্ষী ও কর্তারা তাঁর প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। আতরের তুলা এক হাতে ধরে বলেন আবদুল হাফিজ, আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ছি, তাই পাক–পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত। মউত কখন আসে, সাধারণত আমরা তা জানি না। কিন্তু এ এক দিক দিয়ে ভালোই যে, আমি জানতে পারছি, আমি কবে মরবো। মরার আগে কলেমা তৈয়ব পাঠ করে যেতে পারবো। পবিত্র দেহে খাস নিয়ত নিয়ে মরতে পারবো।

বদরিয়ারা আসে। আবদুল হাফিজের যাবার সময় হয়।

আবদুল হাফিজ এগিয়ে যান শফি আকবরের দিকে। শফি আকবরের চোখে পানি।

কাঁদছেন কেন, কাঁদবেন না। বিপদে ধৈর্য ধরুন। আল্লাহতালার নির্দেশ।

হাফিজ হাত ধরেন শফির। বলেন, ভাই, আমার নসিবে কি ঘটতে যাচ্ছে, আমি জানি। আপনার নসিব আমাদের জানা নাই। আল্লাহ্ আপনাকে হেফাজত করুন। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ আপনাকে এ বিপদ থেকে যেন রক্ষা করেন। যদি আপনি কোনো দিন এই কয়েদখানা থেকে নাজাত পান, তাহলে আমার স্ত্রীর কাছে যাবেন। তাঁকে বলবেন, মৃত্যুর আগে আমি খুব শান্তিতে ছিলাম। মনে একটা বড় সুখ ছিল, আমি এক বড় গোমরাহি থেকে মুক্ত হতে পেরেছি; এক বড় ভ্রান্তির পথ ছেড়ে আসতে পেরেছি। যদি একজন জামাতিয়া হয়ে আমাকে মরতে হতো, তাহলে মরার পর নিশ্চয়ই আল্লাহতালা আমাকে শান্তি দিতেন না। আমি এখন খুব শান্তিতে আছি, বড় হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে–আমার বিবিকে বলবেন। আপনি সাহস হারাবেন না। এই জামায়াতিয়াদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, বিদায় হজ্বের ভাষণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলে গেছেন, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অতীতে বহুজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি আসেন। বদরিয়ারা টানতে থাকে আবদুল হাফিজকে।

তাঁকে যে জায়গাটায় নেয়া হয়, তা আবদুল হাফিজের পূর্ব পরিচিত। সেই ছোট–খাট স্টেডিয়ামটি। চারদিকে গ্যালারি। জনতার উপস্থিতিতে এখানে শাস্তি কার্যকর করা হয়। মধ্যখানে একটা কাঠের ফাঁদমতো মঞ্চ। এখানেই ঘাড় পেতে দিতে হয়। হাত–পা–মাথা কাঠের ফাঁদে আটকা থাকে। তারপর জল্লাদের শাণানো তরবারির এক কোপ। আবদুল হাফিজের মস্তক ঢেকে দেয়া হয় কালো কাপড়ে। দুচোখে কিছুই দেখতে পান না তিনি। শুধু অন্ধকার। তাঁকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হয় কতল–মঞ্চে।

আজ গ্যালারি ফাঁকা। একজন দলত্যাগী জামাতিয়াকে কতল করবার দৃশ্যটি জামাতিয়াদের দেখানো হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, তা জানেন আতিউর রহমান মিজানী।

জল্লাদটি তরবারির ধার পরীক্ষা করে। ধার ঠিক আছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে ঠিক নেই।

আবদুল হাফিজ লোকটি তার পরিচিত। এঁকে সে অনেকবার এই গ্যালারিতে দর্শকদের আসরে দেখেছে। একজন সহকর্মীকে আজ সে কতল করতে যাচ্ছে। তার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে তরবারি নামানোর পরে দেখা যাবে, ঘাড়টা পাষাণের মতো শক্ত। তার মনে হচ্ছে, সে এই লোকটিকে ছেড়ে দেয়।

এই দ্বিধা মুহূর্তের জন্যে। কারণ জল্লাদটি জানে, এই দ্বিধার অর্থ নিজের ঘাড় তরবারির নিচে পেতে দেয়া। জামায়াতিয়া মওদুদিয়া এমন এক ফাঁদ, যেখানে মাথা ঢুকিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু বের করা যায় না।

আপনি কলেমা পড়েন।

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর।

ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে লাল তরল গড়ায়, ছিটকায়, শুকায়। আরো রক্ত ঝরে। কতো রক্ত, কে হিসেব করতে পারে?



চেতনা ও নিশ্চেতনার মধ্যবর্তী এক স্তরে যেন অবস্থান করছেন তিনি, শফি আকবর। কতোদিন তিনি যাপন করছেন এই বন্দীজীবন, চার দেয়ালের মধ্যখানের এই অন্ধকার খণ্ডিত জীবন, তিনি মনেও করতে পারেন না। মাঝে-মধ্যে ঘটে যায় এটাসেটা, তার চোখের সামনে; কোনো কোনো ঘটনায় জড়িয়ে থাকেন তিনি নিজেও, কিন্তু এ সবের কোনো কিছুরই কর্তা নন তিনি; কোনো কিছুই ঘটে না তার আপন ইচ্ছায়। গাল ভর্তি দীর্ঘ দাড়ি, মাথায় স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী এলোমেলো চুল; চামড়া লেগে আছে হাড়ের সঙ্গে- তাঁর শরীরের এসব পরিবর্তন তার চোখেও পড়ে না। কবে তিনি ছাড়া পাবেন এই বন্দীদশা থেকে, তাঁর বিচারপ্রক্রিয়া আর কতো প্রলম্বিত হবে, তিনি জানেন না; জানার কোনো চেষ্টাও নেই তাঁর; যেন এই তাঁর অমোঘ নিয়তি – এমনিভাবে সবকিছুর মধ্য দিয়ে চলেছেন তিনি।

ইনকিলাব সংঘটিত হবার পর এদেশে প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কতো শিল্পী ছেড়েছে এ দেশ, কতো শিল্পীকে হত্যা করা হয়েছে; কতোজন পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি মোটামুটি নির্বিরোধ জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। দু'একজন বির্মূত ছবি আঁকার পথ ধরেছে; কিন্তু নিজের আত্মার সঙ্গে তিনি যেহেতু প্রতারণা করতে পারেননি, পেশা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ক্যালিগ্রাফী বা অক্ষর-বিন্যাসের পথ। কিন্তু একটি ভালো কাজ, একটি শিল্পোত্তীর্ণ চিত্রকর্ম করার আকাঙ্ক্ষা আর তাড়না তাঁর হৃদয় থেকে মুছে যায়নি কখনো। আজ যখন তিনি যাপন করছেন বন্দীজীবন, যখন তাঁর স্ত্রী নাসিমার কাছ থেকে বহুদূরে তিনি, এবং যখন জানেন না নাসিমার কুশল পর্যন্ত – তাঁর মনে হয়, আহা, এখন যদি একটা ক্যানভাস পাওয়া যেতো!

মস্তিষ্কের ভেতরে, চেতনা-নিশ্চেতনা-অবচেতনার বকযন্ত্র থেকে কতগুলো বোধ তাঁকে উন্মাতাল করে তোলে, একটা ছবি আঁকবার আকুলতায় তিনি ছটফট করেন। হঠাৎ কোত্থে কে এলো এই বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউ? নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করেন শফি আকবর।

উত্তর মেলে না।

কতোগুলো খণ্ড ছবি শুধু চলচ্চিত্রের মতো নাচতে থাকে চোখের সামনে। তিনি দেখেন বিশ বছরের এক তরুণ আর সতেরো বছরের এক তরুণীকে আনা হয়েছে মিজানীমহলের বিচার কক্ষে; নিকট পড়শী এই দুইজনের অপরাধ- তারা তাকিয়েছিল পরস্পরের দিকে, বিনিময় করেছিল হাসি, তারপর একদিন দুই বাড়ির মধ্যবর্তী দেয়ালের এপার-ওপারে দাঁড়িয়ে বিনিময় করেছে চিঠি এবং যে চিঠিগুলোতে প্রমাণ আছে- দুএকবার দেয়ালের বিভাজন অতিক্রমও করেছিল তারা। এ অপরাধে আতিউর রহমান মিজানী তাদেরকে দোররা মারার নির্দেশ দেন, জল্লাদের চাবুক উত্তোলিত হয়, কিশোর দেহ দুটি লুটিয়ে পড়ে ভূমিতে; রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়। এসব দৃশ্য নাচতে থাকে শফি আকবরের চোখের সামনে; তিনি মাথায় অনুভব করেন তীক্ষ্ণ ব্যথা; কাতরাতে

থাকেন একাকী, নিঃসঙ্গ প্রায়ান্ধকার কক্ষটিতে।

তাঁর তৃষ্ণা বোধ হয়, একটু পানির জন্যে তিনি বদরিয়াদের সাহায্য চাইবেন কিনা, দ্বিধান্বিত হন।

তাঁর হাত আবার নিশপিশ করে ওঠে, মনে হয়, একটি তুলি আর ক্যানভাস পেলে তিনি একটি অপূর্ব ছবি আঁকতে পারতেন। শিল্পীদের একটি নিজস্ব চোখ থাকে, যে চোখ এতোদিন শফি আকবরের ভেতরে সুপ্ত ছিল, আজ তা যেন আবার ফিরে পায় জ্যোতি। সঙ্গেসারের একটি দৃশ্য তার মস্তিষ্কে নৃত্য শুরু করে। বিবাহিত আওরাত জেনা করায় তাহার ছঙ্গেছার হইতেছে– এরূপ ঘোষণা তার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিসহ বেজে ওঠে। এক গোলাকার স্টেডিয়াম শোভন মাঠের মধ্যখানে এক অপূর্ব সুন্দর নারীকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ফেলা হয়; তারপর পাথরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে থাকে তার প্রতি; তার নাক থেৎলে যায়, রক্ত ঝরে, তার চোখ ক্ষতবিক্ষত হয়, রক্তঝরে; তার মস্তক কেটে–ফেটে –ছিড়ে একাকার হয়ে যায়, রক্ত ঝরে; তার আর্তনাদ দর্শনার্থীদের উল্লাসের নিচে চাপা পড়ে যায়।

শফি আকবর গোঙাতে শুরু করেন। দুজন বদরিয়া দৌড়ে আসে। শফি আকবর তাদের চিনতে পারেন না। তাঁর মনে হয় তিনি তৃষ্ণার্ত।

আতিউর রহমান মিজানী ফাইলটা উল্টে পাল্টে দেখেন। ফাইলের ওপরে ধূলি পড়ে আছে। বহুদিন দেখা হয় না। ইদানীং এসব কাজকর্ম তাঁর আর ভালো লাগে না; বয়স হয়েছে, শরীরে কুলায় না; তাছাড়া মনও ভালো নেই। কেমন নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। বড় অর্থহীন মনে হয় এ জীবন যাপন। মৃত্যুভয় জাগে। এতো দীর্ঘ জীবন তাঁর; তবু বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনোদিন কমেনি। আজ বড় ভয় হয়। যেতে তো হবেই।

এই তো কিছুদিন আগে খাদেম মোল্লা চলে গেল। তার এতো দিনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গী। কোনো সুদূর অতীতকাল থেকে সে তাঁর সঙ্গে আছে, এ বৃদ্ধ বয়সে ঠিক মনেও পড়ে না। একাত্তরের গণ্ডগোলের সময়ে কি খাদেম ছিলো? কি সব জেহাদী দিন গেছে! পাকিস্তান–আর্মিকে ডেকে এনেছিলেন গ্রামে; হিন্দুস্তানের দালালদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে; আল্লাহ কি সেইসব সোয়াবের প্রতিফল তাকে দেবেন না! আর ওই যে কমিউনিস্ট আর হিন্দুস্তানের দালাল মাস্টার–লেখক–সাহিত্যিক–ডাক্তার–সাংবাদিকদের ধরে ধরে মারা, ওই পরিকল্পনার সঙ্গে কি খাদেম মোল্লা ছিল? কেমন ধন্দ লাগে! ইদানীং তাঁর শরীর স্বাস্থ্য আসলেই ভেঙে পড়েছে, হুঁশ–জ্ঞানও কমেছে!

নিজের মেয়ে নাতী–নাতনীদেরও অচেনা অচেনা লাগে। ফাইলটা তিনি নিজচোখে পড়ে উঠতে পারেন না। তার এক নতুন সহকারী জুটেছে। তিনি বলেন, নও–সাহাবা। সে পাঠ করে শোনায়। শফি আকবরের মামলা, মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। ফয়সালা হওয়া দরকার। শফি আকবর হিন্দুস্তানের দালাল, কঠিন ক্রিমিনাল। কিন্তু দোষ স্বীকার করে নাই। অনেক কায়দা করা হয়েছে, মুখ ফোটানো যায়নি। সর্বশেষ রিপোর্ট : মাঝে মধ্যে তার আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। যেন কাউকে চিনতে পারে না। মিজানী হাসেন। বৃদ্ধমুখাবয়বে সেই হাসি কেবল বিকৃত অঙ্গভঙ্গির মতো দেখায়। নও সাহাবাটি সে দিকে তাকিয়ে ভয় পায়। মিজানী ভাবেন– সব অভিনয়; নাজাত পাবার, আজাদ হবার ফন্দি–ফিকির। হিন্দুস্তানের দালাল। কঠিন ক্রিমিনাল।

আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দিনকাল ভালো নয়। চারদিকে দুঃসংবাদ। এ জনপদে এক নতুন অচেনা মারাত্মক রোগ দেখা দিয়েছে। ঝিনঝিন রোগ। হাত–পা কাঁপতে কাঁপতে লোকে মারা যায়। নানা ফকিরী–হেকিমী করেও রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যাচ্ছে না। মহল্লার পর মহল্লা সাফ

হয়ে যাচ্ছে। লোকজন ভয়ে এলাকা ত্যাগ করছে। অবশ্য মিজানীর ভয় এখানে নয়, অন্যত্র। লোকজন সব পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অন্য এক এলাকায়। গভীর জঙ্গলের ওপারে। সেখানে হিন্দুস্তানের দালালেরা ক্যাম্প খুলেছে। ট্রেনিং চলছে। আবদুল হাফিজের বন্ধু বান্ধবেরা সেই শিবিরে যোগ দিয়েছে। দলে দলে লোক জামাত ত্যাগ করে সেখানে যাচ্ছে। এ অবস্থায় শফি আকবরের মতো দালালকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। এসব শিল্পী–সাহিত্যিককে যতো তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততোই মঙ্গল। না, শফি আকবরকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। কোনো কথা আর আদায় করা যাবে না। অযথা এই মহলের অন্ন ধ্বংস।

আগামীকাল সকালে তলোয়ারের কোপে তাকে কতল করা হবে– বিড় বিড় করেন মিজানী। নও–সাহাবাটি তাঁর মুখের দিকে তাকায়। কি করতে হবে সে বোঝে না। ছাগল–মনে মনে গালি দেন মিজানী। মুখে অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন– লেখো– শফি আকবরকে কতল করা হোক। আগামীকাল সকালে। তলোয়ারের কোপে।

নিচে নামসই করেন । মৃত্যুদণ্ডের হুকুমনামার অনুলিপি দুপুর বেলাতেই পৌঁছে যায় শফি আকবরের কাছে। কয়েদখানার খাদেম তাঁকে হুকুমনামাটি পড়ে শোনান। শফি আকবর চুপ করে থাকেন। তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়েছে, এই ভঙ্গিতে বলেন, কিন্তু আমার যে একটা ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে আমি একটা ছবি আঁকি।

আকুলতা ঝরে পড়ে শফি আকবরের কণ্ঠে। খাদেমটি বলেন, হ্যাঁ, মউতের আগে আমরা আপনার আখেরী খায়েশ পূর্ণ করার মওকা দেবো। বলেন, আপনার কি কি লাগবে।

শফি আকবর তাকে ছবি আঁকবার সরঞ্জামের একটি তালিকা দেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। রাত্রি নামে। শফি আকবর অস্থির হয়ে পড়েন। তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম আসে না কেন? তার রং তুলি–ক্যানভাস–ইজেল কখন আসবে? কি আঁকবেন তিনি? কিভাবে শুরু করবেন? কল্পনার ভেতর থেকে রং আর রেখা খুঁজে ফেরেন শফি।

দুজন বদরিয়া কর্মী তার কাছে আসে। কোনো কথা না বলে তারা বোঝা নামিয়ে রাখে– তার ছবি আঁকার যোগাড়যন্ত্র। আনন্দে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েন শফি। আলো জ্বালাও।

তিনি চিৎকার করে ওঠেন। বদরিয়ারা দৌড়ে আসে।

আমি ছবি আঁকবো, আমাকে আলোর ব্যবস্থা করে দাও।

যথেষ্ট আলো আছে। এতেই চলবে। এই তো গায়ের রোমটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জবাব আসে। শফি আকবরের মনে হয়, না, আলো নেই। কোথায় আলো? এতো অল্প আলোয় কি ছবি আঁকা যায়?

তিনি হতোদ্যম হয়ে বসে পড়েন। বদরিয়ারা কক্ষ ত্যাগ করে। রাত বাড়ে। শফি আকবরের মাথার ভেতরটায় ফের নাড়া দিয়ে ওঠে। একটা শিল্পীজীবন তাঁর ব্যর্থ হতে চলেছে। এই রাত ভোর হলেই তাঁকে চলে যেতে হবে জীবনের ওপারে। এ জীবনে তিনি কিছুই করে যেতে পারলেন না। এই তো শেষ সুযোগ। তাঁকে পারতেই হবে।

তিনি উঠে দাঁড়ান। ক্যানভাস জোড়েন। রঙ গোলান। তুলি হাতে ধরেন। সামনে ধূসর ক্যানভাস। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে রেডিয়াম লাইটের মতো। তিনি তুলিতে রঙ লাগান। কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া পান না। তাঁর কিছুই মনে আসে না। তাঁর হাত সঞ্চারিত হয় না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন হতভম্বের মতো। রাত বাড়ে। তিনি তার হৃৎযন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পান। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এই রাত কেটে গেলেই জীবনাবসান। একি করছেন তিনি? তিনি নিজের হাত নিজেই কামড়ে ধরেন। হাত চলে না।

তিনি মাথা দেয়ালে ঠুকতে শুরু করেন। রক্ত লেগে যায় দেয়ালে। তিনি মেলায় হারিয়ে যাওয়া

বালকের মতো কাঁদতে শুরু করেন।

শাদা ক্যানভাস শূন্য থাকে। এক অক্ষম শিল্পী ব্যর্থতার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তাঁর মনে হয় তিনি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন। তিনি রঙের ডিব্বা উল্টিয়ে ফেলেন। ক্যানভাস দাঁতে ছিঁড়তে থাকেন। তুলিগুলো এদিক সেদিক ছুড়তে শুরু করেন।

তাঁর সবকিছু এলোমেলো হয়ে পড়ে। দুচোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে, মাথার ভেতরে শব্দ হয় দপদপ।

তিনি এক ধূসর নিশ্চেতনার ভেতরে শায়িত হন।



অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ আলোর চিকন রেখা খেলা করে ওঠে বিদ্যুতের মতো। কলরব, হট্টগোল। জেগে ওঠেন শফি আকবর।

চারদিকে ছড়ানো–ছিটানো তাঁর ছবি আঁকার জিনিসপত্র। পাতলা আলোয় সেসব চোখে পড়ে।

অতৃপ্তির বিষণ্নতা যেন লেপ্টে আছে এই আলোয়। আজকের এই ভোর তাঁর জীবনের শেষ ভোর– তাঁর মনে পড়ে। আজ তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

বাইরে কলরব। মানুষের মিলিত আওয়াজ। পদশব্দ। বদরিয়ারা আসছে দলবেঁধে, টের পান শফি আকবর। একটা ভালো ছবি আঁকার সাধ অপূর্ণ রেখেই চলে যেতে হবে তাঁকে।

পদশব্দ নিকটতর হয়। শফি আকবর উঠে বসেন। চারদিকে দৃষ্টি ফেলেন। ওই তো তাঁর তুলি, রঙ, ক্যানভাস, স্ট্যান্ড, ইজেল। আমাকে কি এখনই যেতে হবে? নাকি আরো খানিকটা সময় দেয়া হবে?

হৈচৈ তীব্র হয়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এসে পড়ে বদরিয়ারা। তাঁর দরজায় ধাক্কা পড়ে। তিনি দরজা খোলেন না। দরজায় সজোর আঘাতের শব্দ হয়।

শফি আকবরের বুক কাঁপে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়। তিনি উঠে দাঁড়ান।

দরজা খোলেন। এক ঝলক আলো এসে পড়ে মেঝেতে।

আলো।

রোমাঞ্চিত বোধ করেন শফি আকবর। এমন আলো থাকলে তো তিনি ছবিটা সম্পন্ন করতে পারতেন!

হুড়মুড় করে একদল নারী–পুরুষ ঢুকে পড়ে ঘরে।

বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন – চিৎকার করে তারা। তাদের চোখে–মুখে ব্যস্ততা, রাত–জাগা ক্লান্তি আর বিজয়ীর হাসি।

কিছু বুঝে উঠতে পারেন না শফি। যারা এসেছে তাদের বেশ–বাশ দেখে মনে হয়, তারা বদরিয়ার নয়। নারীরা সুসজ্জিতা, শাড়ি পরিহিতা। কোথায় যেতে হবে আমাকে, বিস্মিত শফি জানতে চান।

যেখানে খুশি যান, আপনি মুক্ত।

অভিভূত হয়ে পড়েন শফি আকবর। তাঁর চোখ ভরে জল নামে।

আচ্ছা, এটা তো কক্ষ নং ২৭। এখানে তো আব্দুল হাফিজের থাকবার কথা। তিনি কোথায়? জানতে চায় দলের একজন।

তিনি তো নেই। তাঁকে কতল করা হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেন শফি।

আপনার নাম কি?

আমার নাম, শফি আকবর।

প্রশ্নকর্তা জড়িয়ে ধরেন শফিকে।

আমার নাম আসাদ-বিন-হাফিজ। আমি আব্দুল হাফিজের বন্ধু। আপনাকে আমরা সবাই চিনি। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন আমাদের সঙ্গে।

শফি তাদের সঙ্গে রওনা হন। শত শত বন্দী বেরিয়ে পড়েছে কয়েদখানা থেকে। হৈচৈয়ে কান বন্ধ হবার জোগাড়। শ্লোগান উঠছে – জামাতিয়া মওদুদিয়া-মুর্দাবাদ। জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, মিজানীর দোজখখানা।

শফি আকবর মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর উদ্ধারকারী দলটির পেছন পেছন চলতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারেন না, হঠাৎ এই অন্ধকার জনপদে আলোর স্পর্শ লাগলো কিভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা মিজানীমহলের ফটক পেরিয়ে বাইরে আসেন। ক্রুদ্ধ জনতা মিজানীমহলে ভাঙচুর করছে। কেউ কেউ শাবল লাগিয়ে ইট খুলছে। একদল নারী এক জায়গায় জোট বেঁধে কাঁদছে।

আসাদ-বিন-হাফিজ তাঁদের কাছে গিয়ে খোঁজ নেন – ব্যাপার কি। জানা যায়, তারা এই মহলের হেরেমখানায় বন্দী ছিল বাঁদীবেশে। এখন মুক্তির আনন্দে কাঁদছে।

শফি আকবরের মনে হাজার প্রশ্ন। তাঁর স্ত্রী কেমন আছে, কোথায় আছে? আতিউর রহমান মিজানীর কি হলো?

তাঁর সঙ্গের দলটি নানা কথা বলাবলি করছে। তিনি কান পাতেন।

মিজানীকে বন্দী করা হয়েছে। তাঁর বিচার হবে।

আবার সেই একই ভুল। সেই বিশ শতকের একাত্তর সালে একবার এদের বন্দী করা হয়েছিল বিচারের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা মুক্তি পেয়ে যায়। এবার আর ভুল করা ঠিক হবে না।

বক্তাটি ঘুরে দাঁড়ায়।

মিজানী আমার ভাইয়ের হাত কেটেছে। আমি ওকে ছাড়বো না।

আরেকজন খেপে ওঠে। সে আমার ভাইকে কতল করেছে।

সে আমার বোনকে বাঁদী বানিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে।

মিজানীর কল্লা চাই। জনতা একসঙ্গে গর্জে ওঠে। তারা আবার মিজানীমহলের দিকে দৌড়াতে থাকে।

আসাদ-বিন-হাফিজ হাত ধরেন শফি আকবরের।

আপনি ওদিকটায় যাবেন না। আমি আপনাকে আপনার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে ওয়াদাবদ্ধ। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় নাসিমা? কোথায়? চলুন।

খুব কাছে নয়। এই জঙ্গল আর পাহাড়ের ওপারে হিটংছড়িতে আমাদের ক্যাম্প। সেখানেই আছেন আপনার স্ত্রী। তাকে আমরা কথা দিয়েছি আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবোই।

আসাদ-বিন-হাফিজের মনে পড়ে যায় আব্দুল হাফিজের কথা। তাঁরা এই বন্ধুটিকে হারালেন। তাঁর স্ত্রী শাহিদা বেগম আজকের এই মিজানীমহল- অভিযানে অংশ নিয়েছেন। স্বামীকে মুক্ত করবার ব্রত কাজ করেছে তাঁর অন্তরে।

বস্তুত আজ রাতের এই মওদুদিয়া-বিরোধী লড়াইয়ে নারীদের ভূমিকাই মুখ্য। পরিকল্পনাটা প্রধানত আসাদ-বিন-হাফিজেরই। পাহাড়ের ওপারে হিটংছড়ি উপত্যকায় বহু বিরোধী মতাবলম্বী আগে থেকেই শিবির গড়ে তুলেছিল। মাস পাঁচেক আগে আসাদ-বিন-হাফিজ, আব্দুল কাইয়ুম, শাহিদা বেগম যোগ দেন সেই শিবিরে। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান শফি আকবরের স্ত্রী নাসিমা

আকবরকেও। সেখানে সব কওমীলীগার, এনএনপি কর্মী এমনকি দলত্যাগী জামাতিয়ারা ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের মত বিভিন্ন, কিন্তু একটি মূল বিষয়ে তারা একমত – ধর্মের নামে রাজনীতিকে মোকাবেলা করতে হবে। প্রথম আঘাতটা করা হবে মিজানীমহলে। অস্ত্রসহ প্রশিক্ষণও চলে। সেই প্রশিক্ষণের ফলটা পেতে আরো সময় লাগতো। কিন্তু তর সইছিল না অনেকেরই। যেমন শাহিদা বেগম অধীর হয়ে পড়েছিলেন তাঁর স্বামীকে মুক্ত করে আনার জন্য। ব্যাকুল ছিলেন নাসিমা আকবরও। এমন স্বজন–বঞ্চিত নারী–পুরুষ আছে অনেক। তখন বুদ্ধিটা বেরোয় আসাদের মাথা থেকে। তিনি বিষয়টি পান বহু বছর আগে লেখা বেগম রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন নামের একটি বইয়ে। নারীরা একযোগে সার্চ লাইট হাতে বেরিয়ে বন্দী করেছিল পুরুষদের – এই হচ্ছে সুলতানার স্বপ্নের মূল কথা। মিজানীমহল অভিযানে সেই ধারণাটিই ব্যবহৃত হয়েছে। নারীদের বোরখা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সব নারী পরেছে শাড়ি, কপালে দিয়েছে টিপ, চোখে কাজল, খোঁপায় ফুল।

তারপর হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। নারী–পুরুষের মিলিত দলটির অগ্রভাগে থাকে নারীরা। তারা একযোগে ধাবিত হয় মিজানীমহলের দিকে। মেয়েরা পথে নামতেই আকাশ থেকে নেমে আসে চাল–ধোয়া জ্যোৎস্না। সেই অলৌকিক মায়া–জাগা আলোয় সার বাঁধা মেয়েদের দেখলে বিভ্রম জাগতে বাধ্য। বাস্তবে তাই ঘটে। যে বদরিয়া–শিবির খোলা আকাশের নিচে কোনো রমণীকে কল্পনা করতে পারে না, বোরখা ছাড়া ভাবতেও পারে না কোনো নারীমূর্তি, অসংখ্য পুষ্পসজ্জিতা নারীকে দেখে তারা হতবাক হয়ে পড়ে। তারা ভয় পায়, কেউ মূর্ছা যায়, কেউ দৌড়ে পালায়। সম্পূর্ণ বিনা–বাধায় নারীবাহিনী মিজানীমহলে ঢুকে পড়ে।

আসাদের দায়িত্ব কয়েদখানা ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করা, আসাদ তার কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বিবাদে।

কিন্তু আব্দুল হাফিজকে পাওয়া গেলো না। সে আর এই ইহলোকে নেই। তাঁর স্ত্রী শাহিদা প্রতীক্ষা করছে তাঁর জন্য।

কিভাবে আসাদ সামনে দাঁড়াবেন তাঁর, এসব কথা ভিড় করে তাঁর মনে। শাহিদা বেগম আছেন মিজানীমহলের অন্তপুর অভিযানে। আব্দুল হাফিজকে নিয়ে তাঁর সামনে একবার যাবেন, এমনি ইচ্ছা ছিল আসাদের। কিন্তু এখন তাঁর সাহস হচ্ছে না শাহিদার সামনে দাঁড়ানোর। শফি আকবরকে নিয়ে তিনি রওনা হন হিটিংছড়ির দিকে।

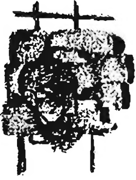
আমরা কোথায় যাচ্ছি? জিজ্ঞাসা করেন শফি।

আমরা যাচ্ছি হিটিংছড়ি ক্যাম্পে। আপনি যাচ্ছেন আপনার স্ত্রীর কাছে।

আমি কি মুক্ত আসলে? আমি কি আসলেই দেখা পাবো নাসিমার? একি স্বপ্ন, মায়া, নাকি বাস্তবতা? আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন শফি।

ঘন জঙ্গল। এবড়ো–থেবড়ো পথ। ভোর হচ্ছে। নরম আলো নামছে আকাশ থেকে। পাতাগুলোকে মনে হচ্ছে স্বপ্নের। আসাদ আর শফি চলেছেন দ্রুতবেগে। অনেক দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনীর প্রতীক্ষা শেষে শফি আকবর আজ সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। বুনো ফুল ফুটে আছে কোথায় কোন জঙ্গলে। ঘুম–জড়ানো গন্ধ আসে তার।

শফি আকবর পা টেনে টেনে হাঁটেন। মুক্তির আস্বাদ অন্যরকম। প্রিয়জনের কাছে যাবার অনুভূতিটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আর আছে দীর্ঘদিন জামাতিয়া শিবিরে বন্দী থাকবার এবং অত্যাচারিত হবার অভিজ্ঞতা। সব মিলিয়ে একটা ভালো ছবি হতে পারে। স্বার্থপরের মতো ভাবছেন তিনি। দীর্ঘদিন পরে নাসিমাকে দেখতে যাচ্ছেন, সে এতোদিন কোথায় ছিল, কেমন ছিল জানা হয়নি, অথচ তার কথা না ভেবে নিজের শিল্পী–আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মত্ত তিনি! ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হন শফি।



নাসিমা বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছেন এই দিনটির জন্য। শফিকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য তিনি কিন্তু কম চেষ্টা করেননি। কতো জায়গায় গেছেন, কতো কি করেছেন। আজ সেই শুভ দিন।

এ তাঁবুতে কেউ নেই। সবাই গেছে মিজানীমহল অভিযানে। তিনি যেতে পারেননি। এখন তিনি একা। ইতিমধ্যে খবর এসে গেছে, মিজানীমহলের পতন ঘটেছে। শফি আকবর মুক্তি পেয়েছেন,. আসাদ-বিন-হাফিজের সঙ্গে এই ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়বেন তিনি। কি দিয়ে বরণ করবেন নাসিমা শফি আকবরকে?

নাসিমা তাঁবুর বাইরে আসেন। ভোরবেলার পাহাড়ী প্রকৃতি আজ অনেক বেশি আলোকিত। পাখি ডাকছে। লম্বা ঘাসে লাফাচ্ছে ফড়িং আর প্রজাপতি। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

ক্যাম্পের আলো এখনো নেভানো হয়নি। নেভানো দরকার। এই ক্যাম্পের প্রয়োজন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। কারণ সমুদ্র উপকূলের একটি জনপদে জামাতিয়াদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু রাজধানীসহ সমগ্র দেশ এখনো জামাতিয়াদের দখলে। লড়াই কেবল শুরু হয়েছে। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

শফি আকবর আসছেন। নাসিমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। চোখ ভিজে ওঠে অশ্রুতে। তাঁর শরীরের পরিবর্তনের দিকে নজর পড়ে। শরীরের মধ্যে বেড়ে উঠেছে অন্য একটা শরীর। অন্য একটা প্রাণ তিনি ধারণ করে আছেন তাঁর শরীরের মধ্যে। কতো দিন পর। কতো বছর আগে তাঁর প্রথম সন্তান এসেছিল গর্ভে। কি আনন্দ, উৎকণ্ঠা আর মমতার মধ্যে বেড়ে উঠেছিল সে। বাঁচেনি। জেনিটাল প্রবলেম। এরপর ডাক্তারের পরামর্শে আর কোনো সন্তান নেননি তাঁরা। আজ তাঁর গর্ভে আবার প্রাণের স্পন্দন। পাঁচ মাস আগে বদরিয়া-বাহিনীর নিপীড়ন এক রাতের রক্তাক্ত বিভীষিকার মধ্যদিয়েই সমাপ্ত হলো না। শাহিদা বেগমের যত্ন আর শুশ্রূষা তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু গোপনে তিনি বাঁচিয়ে রাখছেন অন্য এক প্রাণ। যাকে পৃথিবীবঞ্চিত করবার কোনো অধিকার তাঁর নেই। আবার এই পৃথিবীতে যার আগমনও কোনো সুখকর ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, শফি আকবরের সামনে তিনি দাঁড়াবেন কোন মুখে? কি বলবেন শফিকে? কাকে দোষ দেবেন? নিজের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলোমেলো পা ফেলেন নাসিমা। খালি পা। ঘাসের ডগায় শিশির। পায়ে শিশির লাগছে। নাসিমার হাঁটতে ভালো লাগে। হাঁটতে হাঁটতে নাসিমা পাহাড়ের গা বাইতে থাকেন। পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের ক্যাম্প দেখতে কেমন লাগবে কে জানে!

হাঁপাতে হাঁপাতে নাসিমা পাহাড়ের চূড়োয় উঠে পড়েন। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে। লাল হয়ে আছে। সবার আগে তিনি দেখতে পান সূর্যটিকে। নিচের দিকে তাকান। তাঁর ১৩ নম্বর তাঁবুটি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। দুজন লোক সেই তাঁবুর কাছে যাচ্ছে। দূর থেকে নাসিমা তাদের চিনতে পারেন। শফি আকবর আর আসাদ। বাঁ দিকে নিচে তাকান নাসিমা। বেশ বড় একটা খাদ। অনেক

গভীর। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে সেখানে। শতাব্দীর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন নাসিমা। কতো দীর্ঘশ্বাস, কতো বঞ্চনা, কতো হাহাকার এমনি অন্ধকারে লীন হয়ে আছে। শত শত বছর ধরে মালে গনিমত হিসেবে যে নারীরা বিজয়ী-পুরুষের সঙ্গিনী হয়েছে, তাদের হাহাকার সঞ্চিত আছে এমনি গোপন অন্ধকার গহ্বরে- পৃথিবীর আলোকিত ইতিহাস তাদের খবর রাখে না। যে ক্রীতদাসীরা সম্ভোগের শিকার হয়েছে পুরুষের, শত শত বছর ধরে, যাদের সঙ্গে আদলের প্রয়োজনও বোধ করেননি ধর্মীয় বিধান, তাদের পরিণতি কি হয়েছে, কি পরিচয় পেয়েছে তাদের সন্তানেরা, ইতিহাস কি সে কথা কখনো ভেবেছে? কিংবা অতদূরেই বা তাকাতে হবে কেন? এই তো কয়েক যুগ আগে এদেশের মাটিতে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে যে দুই লাখ নারী ধর্ষিতা হয়েছে, যাদেরকে পাওয়া গেছে হানাদার বাহিনীর বাংকারে-ক্যাম্পে-ক্যান্টনমেন্টে, যে নারীরা গর্ভে ধারণ করেছে অবাঞ্ছিত ভ্রূণ, কি হয়েছে তাদের, কোথায় সেইসব যুদ্ধশিশু? এ-দেশ সবকিছু বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, সব কিছুর প্রতি অপরিসীম উদাসীনতা এই দেশের, এ-দেশ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করবার, বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার ক্ষমতা রাখে।

নিচে এক অন্ধকার অতল পাহাড়ী খাদ। তিনি একটুখানি সরে এলেই হারিয়ে যাবেন সেই খাদে। সেই খাদটি তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের মত টানতে থাকে।

দূরে পূর্ব দিগন্ত রক্তিম আভায় ভাসিয়ে-ডুবিয়ে সূর্য উঠছে।

নাসিমা আকবর দাঁড়িয়ে আছেন পাহাড় চূড়োয়।

সন্দেশ প্রকাশিত আরো উপন্যাস :

মোরেলগঞ্জ সংবাদ / হাসনাত আবদুল হাই
বাইরে একজন, হাসান ইদানীং / হাসনাত আবদুল হাই
গাভী বিত্তান্ত / আহমদ ছফা
চতুষ্কোণ / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্তর্জলী যাত্রা / কমল কুমার মজুমদার
গরম হাত / সুশান্ত মজুমদার
চন্দ্রের প্রথম কলা / নাসরিন জাহান
তাড়িখোর (আমোস টুটুওলা) / অনুবাদ : জি. এইচ. হাবিব
সম্ভবত শুকতারা মাথার উপর / সৈয়দ আশরাফুল হক
ভালো লাগার বয়স নেই / হালিমা বেগম
দুঃসময়ের বাসিন্দা / মাহফুজুর রহমান